৭১ এর স্মৃতিচারণা

মুক্তিযুদ্ধে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা পর্ব-৬

সংকলক

মো. মাসুদুল করিম অরিয়ন

সভাপতি ও উদ্যোক্তা

(মুক্তিযোদ্ধার ইতিহাস সংরক্ষণ কমিটি বাংলাদেশ)

সম্পাদক

বীর মুক্তিযোদ্ধা মিজানুর রহমান বাচ্চু

(যুদ্ধকালীন কমান্ডার, ৯ নং সেক্টর)

সিনিরয় সহ-সভাপতি, নারায়নগঞ্জ জেলা আওয়ামীলীগ

উপদেষ্টা, মুক্তিযোদ্ধার ইতিহাস সংরক্ষণ কমিটি বাংলাদেশ

তাকিয়া মোহাম্মদ পাবলিকেশন্স ॥ ঢাকা

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০২২

প্রকাশক

মো. আসাদুজ্জামান (মামুন)

তাকিয়া মোহাম্মদ পাবলিকেশন্স

১১,১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

০১৭১২৮৯৯৮৮৯, ০১৯১১০৩৩৩৩৬.

স্বত্ব

মুক্তিযোদ্ধার ইতিহাস সংরক্ষণ কমিটি বাংলাদেশ

অলংকরণ

আয়শা নকীব

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

শেখ তরিকুল ইসলাম উজ্জ্বল

প্রচ্ছদ

মেহেদী হাসান

ISBN : 978-984-91094-7-1

সৌজন্য

নতুন প্রজন্মের কাছে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা ইতিহাস তুলে ধরে
তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ
মুক্তিযোদ্ধার ইতিহাস সংরক্ষণ কমিটি বাংলাদেশ এর কর্মকাণ্ডের অংশ

উ ৎ স র্গ

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
ও
৭৫ এ তাঁর পরিবারের সকল শহিদদের প্রতি

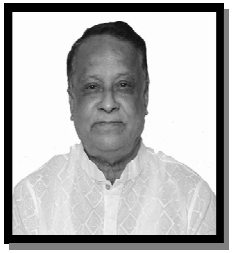

মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির হাজার বছরের কালজয়ী ও সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। অসীম সাহসীকতা, বীরত্ব, আত্মত্যাগ আর অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট উৎরে যাওয়ার এক বড় ক্যানভাস। মুক্তিযুদ্ধের অনেক ইতিহাসই রচিত হয়েছে তবে এর সূর্যসৈনিক যারা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ডাকে সাড়া দিয়ে নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাদের ইতিহাস সংরক্ষীত নেই। কিন্তু তারা বাঙালি জাতির বীর ও সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়তে হলে সেই সব অকুতোভয় কালজয়ী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা ইতিহাস সংরক্ষণ অত্যান্ত জরুরী এবং আগামী প্রজন্মের কাছে এই মুক্তিযোদ্ধাদের অসীম সাহসীকতা, বীরত্বগাথা আত্মত্যাগের ইতিহাস পৌঁছে দেয়া তোমাদেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য। আমরা দিয়েছি স্বাধীনতা আর সেই চেতনায় তোমরা উদ্বুদ্ধ করবে নতুন প্রজন্মকে যুগে যুগে। তাহলেই বঙ্গবন্ধুর আদর্শের আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সোনার বাংলা গড়ে উঠবে।

মাসুদুল করিম অরিয়ন (সভাপতি ও উদ্যোক্তা, "মুক্তিযোদ্ধার ইতিহাস সংরক্ষণ কমিটি বাংলাদেশ") স্বউদ্যোগে মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যক্তিগত যুদ্ধেও বীরত্বগাথা ইতিহাস সংরক্ষণ, প্রত্যক্ষদর্শীর যুদ্ধের বর্ণনা ও মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনচিত্র বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে ওয়েবসাইট www.mssangsad.com ও বই আকারে প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে কাজ করে যাচ্ছে। ৩,৩৭৫ টিরও বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে "মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালা", বাস্তবায়ন সহ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিচারণা নিয়ে রচিত "মুক্তিযুদ্ধে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা পর্ব-১,২,৩,৪,৫,৬..." প্রকাশ করে বিভিন্ন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরে তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে আসছে। ভুয়াদের যুদ্ধের কোন বীরত্বগাথা নেই, আর এরা দেশের শত্রু ও দেশের জনগণের সম্পদ বিনষ্টকারী।

পরিশেষে সরকার ও স্বাধীনতার স্বপক্ষের প্রত্যেক ব্যক্তিবর্গের কাছে মাসুদুল করিম অরিয়ন এর এই দেশপ্রেম মূলক সকল কর্মকাণ্ডে সার্বিক সহযোগীতা কামনা করছি।

ধন্যবাদান্তে

বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. মিজানুর রহমান বাচ্চু (যুদ্ধকালীন গ্রুপ কমান্ডার, ৯ নং সেক্টর)
সিনিয়র সহ-সভাপতি নারায়নগঞ্জ জেলা আওয়ামীলীগ
উপদেষ্টা-মুক্তিযোদ্ধার ইতিহাস সংরক্ষণ কমিটি বাংলাদেশ

সূ চি প ত্র

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ॥ ৯
১৫ আগষ্টের ঘটনা প্রবাহ ॥ ৪১
বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক এম.পি.
(মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়) ॥ ৪৮
বীর মুক্তিযোদ্ধা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল প্রকৌশলী
শহীদউল্লাহ চৌধুরী এনডিসি (অবঃ) ॥ ৫৩
বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. মো. আব্দুর রহিম খান পিপিএম (সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি) ॥ ৭৫
বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব মোঃ জহুর-ই-আলম ॥ ৮৪
বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুজ্জামান মোড়ল ॥ ৯০
বীর মুক্তিযোদ্ধা মোড়ল বজলুল করিম ॥ ১০২

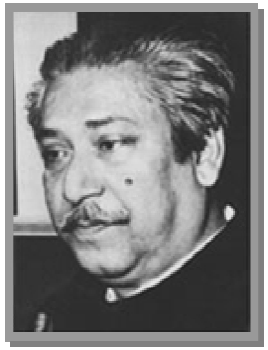

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ (৩রা চৈত্র ১৩২৭ বঙ্গাব্দ) রাত ৮টায় তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার পাটগাতি ইউনিয়নের বাইগার নদী তীরবর্তী টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শেখ বংশের গোড়াপত্তনকারী শেখ বোরহানউদ্দিনের বংশধর। তার বাবা শেখ লুৎফুর রহমান গোপালগঞ্জ দায়রা আদালতের সেরেস্তাদার বা হিসাব সংরক্ষণকারী ছিলেন এবং তার মা সায়েরা খাতুন। চার কন্যা এবং দুই পুত্রের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয়। শেখ মুজিবুর রহমানের বড় বোনের নাম ফাতেমা বেগম, মেজ বোন আছিয়া বেগম, সেজ বোন হেলেন ও ছোট বোন লাইলী এবং তার ছোট ভাইয়ের নাম শেখ আবু নাসের। তার নানা শেখ আবদুল মজিদ তার নামকরণ করেন "শেখ মুজিবুর রহমান"। তার ছোটবেলার ডাক নাম ছিল "খোকা"। ছোটবেলা থেকেই তিনি মানুষের প্রতি সহমর্মী স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। দুর্ভিক্ষের সময় নিজের গোলা থেকে ধান বিতরণ করতেন। সমিতি করে অন্যদের কাছ থেকে ধান-চাল সংগ্রহ করে গরিব ছাত্রদের মধ্যে বিলি করতেন।

শিক্ষা

শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে সাত বছর বয়সে গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। নয় বছর বয়সে ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে গোপালগঞ্জ পাবলিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হন। পিতার বদলিজনিত কারণে ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মাদারীপুর ইসলামিয়া বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি হন এবং সেখানে ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বেরিবেরি নামক জটিল রোগে আক্রান্ত হন এবং তার হৃৎপিণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৯৩৬

খ্রিষ্টাব্দে তার চোখে গ্লুকোমা ধরা পড়ে ও অস্ত্রোপাচার করাতে হয় এবং এ থেকে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করতে বেশ সময় লেগেছিল। এ কারণে তিনি ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চার বছর বিদ্যালয়ের পাঠ চালিয়ে যেতে পারেননি। তিনি ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে সুস্থ হবার পর গোপালগঞ্জে মাথুরানাথ ইনস্টিটিউট মিশন স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। এ সময়ে তার গৃহশিক্ষক ছিলেন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী এবং বহু বছর জেল খাটা কাজী আবদুল হামিদ (হামিদ মাস্টার) নামীয় জনৈক ব্যক্তি। পরবর্তীকালে গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল থেকে তিনি ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে শেখ মুজিব কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ (বর্তমান নাম মৌলানা আজাদ কলেজ) থেকে আই.এ. এবং ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত এই কলেজটি তখন বেশ নামকরা ছিল। ইসলামিয়া কলেজে অধ্যয়নকালীন তিনি বেকার হোস্টেলের ২৪ নং কক্ষে থাকতেন। ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার সম্মানার্থে ২৩ ও ২৪ নম্বর কক্ষকে একত্র করে "বঙ্গবন্ধু স্মৃতিকক্ষ" তৈরি করে। ২০১১ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারি কক্ষটির সম্মুখে তার আবক্ষ ভাস্কর্য স্থাপন করা হয়। ভারত বিভাজনের পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে ভর্তি হন। তবে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাবি-দাওয়ার প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনে উস্কানি দেয়ার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে বহিষ্কার করে। পরবর্তীকালে ২০১০ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে নেয়।

ব্রিটিশ ভারতে রাজনৈতিক সক্রিয়তা

শেখ মুজিবের রাজনৈতিক জীবনের সূচনা ঘটেছিল ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে মিশনারি স্কুলে পড়ার সময় থেকে। ঐ বছরই বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসেন তদানীন্তন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এবং খাদ্যমন্ত্রী ও পরবর্তীকালে বাংলা প্রদেশ ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকারী হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী। ঐ সময় বিদ্যালয়ের ছাদ সংস্কারের দাবি নিয়ে একটি দল তাদের কাছে যায়। দলটির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শেখ মুজিব। ব্যক্তিগত রেষারেষির জেরে ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রথমবারের মতো গ্রেফতার করা হয়। ৭ দিন হাজতবাস করার পর তিনি ছাড়া পান। ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি গোপালগঞ্জ মহকুমা মুসলিম ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি এবং

মহকুমা মুসলিম লীগের ডিফেন্স কমিটির সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দেন। এ সময়ে তিনি এক বছর মেয়াদের জন্য নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলা ছাত্রলীগের সম্মেলনে কাজী নজরুল ইসলাম, হুমায়ুন কবির, প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ প্রমুখ যোগদান করেন। শেখ মুজিব এই সম্মেলনের অন্যতম আয়োজক ছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। সেখানে অধ্যয়নকালীন তিনি বাংলার অগ্রণী মুসলিম নেতা হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সংস্পর্শে আসেন। এম. ভাস্করণ তাকে "সোহ্‌রাওয়ার্দীর ছত্রতলে রাজনীতির উদীয়মান বরপুত্র" হিসেবে আখ্যায়িত করেন। একই বছর কলকাতায় ছাত্রনেতা আবদুল ওয়াসেক প্রমুখের নেতৃত্বে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। ঐ সময় থেকে তিনি সক্রিয়ভাবে ছাত্র রাজনীতি শুরু করেন এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বেঙ্গল মুসলিম লীগে যোগ দেন। এখানে তার ছাত্র আন্দোলনের মুখ্য বিষয় ছিল-পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা। ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে বর্তমান বাংলাদেশের কুষ্টিয়ায় নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে শেখ মুজিব বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তিনি কলকাতায় বসবাসরত ফরিদপুরবাসীদের নিয়ে গঠিত "ফরিদপুর ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশনের" সেক্রেটারি মনোনীত হন। এর দুই বছর পর ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের মহাসচিব নির্বাচিত হন।

পাকিস্তান আন্দোলন, যুক্তবঙ্গ ও দেশভাগ

১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে লাহোর প্রস্তাব উত্থাপনের পর মুসলিম লীগ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য মাঠে নেমে পড়ে। মুসলিম লীগের তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিব এ সময় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন।"পাকিস্তান দাবির পক্ষে গণভোট" খ্যাত ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে শেখ মুজিব বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চলে লীগের ওয়ার্কার ইনচার্জের দায়িত্বে থেকে একনিষ্ঠভাবে কাজ করেন। তৃণমূল পর্যায়ে সাধারণ কৃষক সমাজের কাছে গিয়ে তিনি পাকিস্তান দাবির ন্যায্যতার বিষয় প্রচার করে ভোট চান। এই নির্বাচনে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোতে মুসলিম লীগ বিজয় লাভ করে। তবে একমাত্র বাংলায় তারা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং সোহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়। ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই

আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালনের সময় কলকাতায় ভয়ানক হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। মুজিব মুসলিমদের রক্ষা এবং দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক তৎপরতায় শরিক হন। ঐ সময় সোহ্‌রাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখের নেতৃত্বে ভারত ও পাকিস্তান কর্তৃত্বের বাইরে অবিভক্ত স্বাধীন বাংলা গঠনের যে "যুক্তবঙ্গ আন্দোলন" সংগঠিত হয়, শেখ মুজিব তাতেও যুক্ত হন। পরবর্তীকালে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি নিশ্চিত হলে আসাম প্রদেশের বাঙালি মুসলমান অধ্যুষিত সিলেট জেলার ভাগ্য নির্ধারণে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। শেখ মুজিব সিলেট গণভোটে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির পক্ষে সংগঠক ও প্রচারক হিসেবে কাজ করেন। তিনি এসময় প্রায় ৫০০ কর্মী নিয়ে কলকাতা থেকে সিলেট গিয়েছিলেন। গণভোটে জয়লাভ সত্ত্বেও করিমগঞ্জ পাকিস্তান অংশে না থাকা এবং দেশভাগের সীমানা নির্ধারণের সময় পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন ভৌগোলিক অপ্রাপ্তির বিষয় নিয়ে স্বীয় আত্মজীবনীতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

পাকিস্তানে রাজনৈতিক সংগ্রাম

ব্রিটিশ ভারত থেকে পাকিস্তান ও ভারত পৃথক হবার পর শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হন। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করেন, যার মাধ্যমে তিনি উক্ত অঞ্চলের অন্যতম প্রধান ছাত্রনেতায় পরিণত হন। এ সময় তিনি সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সমাজতন্ত্রকেই একমাত্র সমাধান হিসেবে মনে করতে থাকেন।

বাংলা ভাষা আন্দোলন

১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণকালে মাওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত আন্দোলনে অংশ নেয়ার মাধ্যমে শেখ মুজিবের রাজনৈতিক তৎপরতার সূচনা ঘটে। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারি করাচিতে পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে উর্দু বা ইংরেজিতে বক্তব্য দেয়ার প্রস্তাব নাকচ করেন পূর্ব পাকিস্তানের কংগ্রেসের সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি বাংলাকেও গণপরিষদের ভাষা করার দাবি তুলে ধরেন। ঐ সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী

খান ও পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন বাংলা ভাষার বিরোধিতা করলে প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়। এছাড়াও ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ২১শে মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেন। এতে পূর্ব পাকিস্তানে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। প্রতিবাদী শেখ মুজিব অবিলম্বে মুসলিম লীগের এই পূর্ব পরিকল্পিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন। একই বছরের ২রা মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের অংশগ্রহণে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করা হয়। শেখ মুজিব একটি প্রস্তাব পেশ করেছিলেন যা থেকে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ঐ পরিষদের আহ্বানে ১১ই মার্চ ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় ধর্মঘট পালিত হয়। ধর্মঘট পালনকালে শেখ মুজিবসহ আরও কয়েকজন রাজনৈতিক কর্মীকে সচিবালয়ের সামনে থেকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু ছাত্রসমাজের তীব্র প্রতিবাদের মুখে ১৫ই মার্চ শেখ মুজিব এবং অন্যান্য ছাত্র নেতাকে মুক্তি দেয়া হয়। তাদের মুক্তি উপলক্ষে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় শোভাযাত্রা হয় যাতে শেখ মুজিব সভাপতিত্ব করেন। তবে পুলিশ এই শোভাযাত্রা অবরোধ করে রেখেছিল। ১৫ই মার্চ মুজিবের নেতৃত্বে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলা হয়। পুলিশি কার্যক্রমের বিরুদ্ধে শেখ মুজিব অবিলম্বে ১৭ই মার্চ ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে দেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘটের ঘোষণা দেন। ১৯শে মার্চ তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে একটি আন্দোলন পরিচালনা করেন। একই সময়ে ফরিদপুরে কর্ডন প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করায় সেই বছরেরই ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে তাকে আবার আটক করা হয়। ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারি শেখ মুজিবকে জেল থেকে মুক্তি দেয়া হয়। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি আবার চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাবি আদায়ের আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন যার জন্য তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জরিমানা করা হয়। কিন্তু তিনি এই জরিমানাকে অবৈধ ঘোষণা করে তা প্রদান করা থেকে বিরত থাকেন। এরই ধারাবাহিকতায় ২৬শে এপ্রিল ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম লীগ বিরোধী প্রার্থী শামসুল হক টাঙ্গাইলের উপ-নির্বাচনে বিজয় লাভ করেন। শেখ মুজিব তার সেই আন্দোলনের সফলতার জন্য উপাচার্য্যের বাসভবনের সামনে অনশন ধর্মঘট করেন যার জন্য তাকে পুনরায় আটক করা হয়। এ সময়েই তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের

অধিকার আদায়ের আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করা। উল্লেখ্য যে, মৃত্যু-পরবর্তীকালে ২০১০ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই আগস্ট তার হৃত ছাত্রত্ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ফিরিয়ে দেয়। ২৬শে জুন, ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি লাভের পর শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানের পূর্ব পাকিস্তান আগমনকে উপলক্ষ করে আওয়ামী মুসলিম লীগ ঢাকায় দুর্ভিক্ষবিরোধী মিছিল বের করে। এই মিছিলের নেতৃত্ব দেয়ার কারণে এবারও শেখ মুজিবকে আটক করা হয় এবং দুই বছর জেলে আটক করে রাখা হয়। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি মুজিবের জেলমুক্তির আদেশ পাঠ করার কথা থাকলেও খাজা নাজিমুদ্দিন ঘোষণা করেন, "উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে।" এ ঘোষণার পর জেলে থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিয়ে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদকে পরোক্ষভাবে পরিচালনার মাধ্যমে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আয়োজনে তিনি সাহসী ভূমিকা রাখেন। এরপরই ২১শে ফেব্রুয়ারিকে রাষ্ট্রভাষার দাবি আদায়ের দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। একই সময়ে শেখ মুজিব জেলে অবস্থান করেই ১৪ই ফেব্রুয়ারি থেকে অনশন পালনের সিদ্ধান্ত নেন। তার এই অনশন ১৩ দিন স্থায়ী ছিল। ২৬শে ফেব্রুয়ারি তাকে জেল থেকে মুক্তি দেয়া হয়। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে সমাজতান্ত্রিক চীনের তৃতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ২রা অক্টোবর থেকে ১২ই অক্টোবর পর্যন্ত রাজধানী পিকিংয়ে এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শেখ মুজিবুর রহমান চীন সরকারের আমন্ত্রণে ৩০ সদস্যবিশিষ্ট পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে এই সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে চীন সফর করেন।

আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা ও যুক্তফ্রন্ট সরকার

১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে জুন হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী এবং মাওলানা ভাসানী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করলে শেখ মুজিব মুসলিম লীগ ছেড়ে দিয়ে এই নতুন দলে যোগ দেন। তাকে দলের পূর্ব পাকিস্তান অংশের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। তিনি ২৬শে জুন জেল থেকে ছাড়া পান। মুক্তি পাবার পরপরই চলমান খাদ্য সংকটের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অভিযোগে তাকে সাময়িকভাবে আটক করে রাখা হলেও অচিরেই ছাড়া পেয়ে যান। একই বছরের অক্টোবর মাসে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সাথে যুক্ত থেকে লিয়াকত আলি খানের

কাছে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণের চেষ্টা করায় উভয়কেই আটক করা হয়। ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দের ৯ই জুলাই শেখ মুজিবকে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন শেষে দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। একই বছরের ১৪ই নভেম্বর পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই মার্চ এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২৩৭টি আসনের মধ্যে ২২৩টিতে বিপুল ব্যবধানে বিজয় অর্জন করে যার মধ্যে ১৪৩টি আসনই আওয়ামী লীগ লাভ করেছিল। শেখ মুজিব গোপালগঞ্জে আসনে ১০,০০০ ভোটের ব্যবধানে বিজয় লাভ করেন। সেখানে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মুসলিম লীগ নেতা ওয়াহিদুজ্জামান। ৩রা এপ্রিল শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট পূর্ব বাংলা প্রদেশে সরকার গঠন করে এবং ১৫ই মে শেখ মুজিব উক্ত সরকারে যোগ দিয়ে কৃষি, বন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান। ২৯শে মে কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট ভেঙে দেয়। ৩১শে মে করাচি থেকে ঢাকা ফেরার পর বিমান বন্দর থেকেই তাকে আটক করা হয়। ২৩শে ডিসেম্বর মুক্তি লাভ করেন তিনি। ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই জুন শেখ মুজিব প্রথমবারের মতো গণপরিষদের সদস্য হন। ১৭ই জুন আওয়ামী লীগ পল্টন ময়দানে আয়োজিত এক সম্মেলনে ২১ দফা দাবি পেশ করে, যার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২৩শে জুন দলের কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন অর্জিত না হলে আইনসভার সকল সদস্য পদত্যাগ করবেন। ২৫শে আগস্ট পাকিস্তানের করাচিতে গণপরিষদের অধিবেশনে শেখ মুজিব বলেন "Sir (President of the Constituent Assembly), you will see that they want to place the word 'East Pakistan' instead of 'East Bengal'. We have demanded so many times that you should use Bengal instead of Pakistan. The word 'Bengal' has a history, has a tradition of its own. You can change it only after the people have been consulted. If you want to change it then we have to go back to Bengal and ask them whether they accept it. So far as the question of One-Unit is concerned it can come in the constitution. Why do you want it to be taken up just now? What about the state language, Bengali? What about joint electorate? What about Autonomy? The people of East Bengal will be prepared to consider One-Unit with all these things. So, I appeal to my friends on that side to allow the people to give their verdict in any way, in the form of referendum or in the form of plebiscite"

১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ২১-২৩শে অক্টোবর অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আওয়ামী মুসলিম লীগের বিশেষ অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে দলের নাম থেকে "মুসলিম" শব্দটি বাদ দেয়া হয় ও শেখ মুজিবকে পুনরায় দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। ৩রা ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর সাথে আওয়ামী লীগের বৈঠকে দল থেকে খসড়া সংবিধানে স্বায়ত্তশাসন অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানানো হয়। ১৪ই জুলাই রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে সামরিক উপস্থিতির বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব রাখা হয়, যা তিনিই সরকারের কাছে পেশ করেন। ৪ঠা সেপ্টেম্বর তার নেতৃত্বে একটি দুর্ভিক্ষবিরোধী মিছিল বের হয়। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের কারণে এই মিছিলে পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে কমপক্ষে চারজন নিহত হয়। ১৬ই সেপ্টেম্বর শেখ মুজিব প্রাদেশিক সরকারে যোগ দিয়ে একসাথে শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতিরোধ এবং গ্রামীণ সহায়তা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি পাক-ভারত বাণিজ্য চুক্তি সম্মেলনে যোগদান করার জন্য নয়াদিল্লি যান। দলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে পূর্ণাঙ্গ সময় ব্যয় করার জন্যে তিনি ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ৩০শে মে মন্ত্রিপরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট তিনি সরকারি সফরে চীন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন গমন করেন। এই দুই সমাজতান্ত্রিক দেশের নাগরিক জীবন-যাপনের সুবিধা শেখ মুজিবুর রহমানকে সমাজতন্ত্রের প্রতি উজ্জীবিত করে তোলে। ১৯৫৭-৫৮ অর্থবছরের জন্য তিনি পাকিস্তান চা বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন।

সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন

১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা এবং সেনাবাহিনী প্রধান আইয়ুব খান দেশে সামরিক আইন জারি করেন। আইয়ুব খানের সমালোচনা করার জন্য ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর তাকে আটক করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর তারিখে তাকে মুক্তি দেওয়া হলেও, তার উপর নজরদারি করা হয়। ১৯৬০ ও ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কার্যত গৃহবন্দি হিসেবে থাকেন। এ সময় আইয়ুব খান ৬ বছরের জন্য সকল ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। জেলে থাকা অবস্থায় তার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি ভিত্তিহীন অভিযোগ আনা হয়। ১২ই সেপ্টেম্বরে তাকে দুই বছরের কারাদণ্ড ও পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ১৪ মাস একটানা আটক থাকার পর তাকে মুক্তি দেয়া হলেও জেলের ফটক থেকে পুনরায় তাকে গ্রেফতার করা হয়। উচ্চ আদালতে একটি রিট পিটিশন দায়ের করার মাধ্যমে তিনি ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে ২২ সেপ্টেম্বর

জেল থেকে ছাড়া পান। জেল থেকে মুক্তি লাভের পর তিনি গুপ্ত রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু করেন। অন্যান্য সাধারণ ছাত্রনেতাকে নিয়ে গোপনে নিউক্লিয়াস ও স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ নামে সংগঠন গড়ে তোলেন। সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা আদায়ের লক্ষ্যে কাজ করা। শেখ মুজিব ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার স্বাধীনতার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর কাছে সাহায্য চাইলে তিনি প্রত্যাখ্যাত হন। ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারি সামরিক সরকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার পর শেখ মুজিবুর রহমান দলকে পুনরায় সংগঠিত করার উদ্যোগ নেন। ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারি জননিরাপত্তা আইনে তাকে আবার আটক করা হয়। ২রা জুন তারিখে চার বছরব্যাপী বহাল থাকা সামরিক আইন তুলে নেয়ার পর ১৮ই জুন তাকে মুক্তি দেয়া হয়। ২৫শে জুন তিনি অন্য রাজনৈতিক নেতাদের সাথে মিলে আইয়ুব খান আরোপিত বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেমে পড়েন। ৫ই জুন তিনি পল্টন ময়দানে আয়োজিত এক সম্মেলনে আইয়ুব খানের সমালোচনা করেন। ২৪শে সেপ্টেম্বর তিনি লাহোরে যান এবং সেখানে শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে মিলে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ে তোলেন। এটি মূলত বিরোধী দলসমূহের একটি সাধারণ কাঠামো হিসেবে কাজ করেছিল। পুরো অক্টোবর মাসজুড়ে শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে মিলে যুক্তফ্রন্টের সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে তিনি বাংলার বিভিন্ন স্থান সফর করেন। ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে আলোচনার উদ্দেশ্যে লন্ডন যান। শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী সেখানে চিকিৎসাধীন ছিলেন ও একই বছরের ৫ ডিসেম্বর বৈরুতে মৃত্যুবরণ করেন। এরপর ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি মুজিবের বাসায় অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে আওয়ামী লীগকে পুনরায় সংহত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ঐ বৈঠকের প্রস্তাবের ভিত্তিতে শেখ মুজিবকে আওয়ামী লীগের মহাসচিব ও মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশকে দলের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই মার্চ একটি সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়, যার মাধ্যমে মুজিব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধকল্পে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সেনাশাসক রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খানের সামরিক শাসন, রাজনীতির নামে মৌলিক গণতন্ত্র (বেসিক ডেমোক্রেসি) প্রচলন এবং পাকিস্তানের কাঠামোতে এক-ইউনিট পদ্ধতির বিরোধী নেতাদের মধ্যে অগ্রগামী ছিলেন শেখ মুজিব। মৌলিক গণতন্ত্র অনুযায়ী সারা দেশ থেকে ৮০ হাজার প্রতিনিধি নির্বাচন করা হতো ও তাদের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতেন। এ পদ্ধতি অনুযায়ী ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল এবং প্রদেশগুলোকে একত্রে জুড়ে

দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ঐ সময় সামরিক বাহিনীর গণহত্যা আর বাঙালিদের ন্যায্য দাবী পূরণে সামরিক শাসকদের উদাসীনতা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে কাজ করতে গিয়ে মুজিব আইয়ুববিরোধী সর্বদলীয় প্রার্থী ফাতেমা জিন্নাহকে সমর্থন করেন। নির্বাচনের দুই সপ্তাহ পূর্বে ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর তারিখে ভারতের দালাল অভিযুক্ত করে তাকে আটক করা হয়। শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা এবং আপত্তিকর প্রস্তাব পেশের অভিযোগে অভিযুক্ত করে এক বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। অবশ্য উচ্চ আদালতের এক রায়ে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই তিনি মুক্তি পেয়ে যান।

ছয় দফা আন্দোলন

জনসংখ্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং পাকিস্তানের মোট রপ্তানি আয়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ (যেমন- পাট) পূর্ব পাকিস্তান থেকে হবার পরও এতদাঞ্চলের জনগণের প্রতি সর্বস্তরে বৈষম্য করা হতো। এছাড়াও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক সুবিধা আনুপাতিক হারে ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিকভিত্তিতে ক্রমাগত বৈষম্যের শিকার হওয়ায় বিরূপ প্রভাব পড়তে শুরু করে ও প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। এর ফলে, অর্থনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী এবং পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিবিদরা বৈষম্য সম্পর্কে আপত্তি জানাতে শুরু করেন। বৈষম্য নিরসনে শেখ মুজিব ছয়টি দাবি উত্থাপন করেন, যা ছয় দফা দাবি হিসেবে পরিচিত। বাঙালির বহু আকাঙ্ক্ষিত এই দাবি পরবর্তীকালে বাঙালির "প্রাণের দাবি" ও "বাঁচা মরার দাবি" হিসেবে পরিচিতি পায়। ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলসমূহের একটি জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনেই শেখ মুজিব তার ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি পেশ করেন, যা ছিল কার্যত পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের পরিপূর্ণ রূপরেখা। ছয় দফার দাবিগুলো ছিল নিম্নরূপ-

১. যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাধীনে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার হবে। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠান।
২. কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা কেবল মাত্র দুইটি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে- দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতা থাকবে নিরঙ্কুশ।
৩. সমগ্র দেশের জন্যে দুইটি পৃথক অথচ অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা, না হয় বিশেষ শর্তসাপেক্ষে একই ধরনের মুদ্রা প্রচলন।

৪. ফেডারেশনের অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর কর বা শুল্ক ধার্য্যের ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে। তবে, প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অঙ্গরাষ্ট্রীয় রাজস্বের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য হবে।
৫. অঙ্গরাষ্ট্রগুলো নিজেদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার মালিক হবে, এর নির্ধারিত অংশ তারা কেন্দ্রকে দেবে।
৬. আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আধা সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হবে।

শেখ মুজিব এই দাবিকে "আমাদের বাঁচার দাবী" শিরোনামে প্রচার করেছিলেন। এই দাবির মূল বিষয় ছিল-একটি দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে পরিচালিত পাকিস্তানি ফেডারেশনে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন।এই দাবি সম্মেলনের উদ্যোক্তারা প্রত্যাখান করেন এবং শেখ মুজিবকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে চিহ্নিত করেন। এ কারণে তিনি উক্ত সম্মেলন বর্জন করে পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসেন। ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দের পহেলা মার্চে শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনের পর তিনি ছয় দফার পক্ষে সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে দেশব্যাপী প্রচার কার্য পরিচালনা করেন ও প্রায় পুরো দেশই ভ্রমণ করে জনসমর্থন অর্জন করেন। এই ভ্রমণের সময় তিনি সিলেট, ময়মনসিংহ এবং ঢাকায় বেশ কয়েকবার পুলিশের হাতে বন্দি হন। বছরের প্রথম চতুর্থাংশেই তাকে আটবার আটক করা হয়েছিল। ঐ বছরের মে মাসের ৮ তারিখে নারায়ণগঞ্জে পাট কারখানার শ্রমিকদের শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণের জন্য তাকে আবার গ্রেফতার করা হয়। তার মুক্তির দাবিতে ৭ই জুন দেশব্যাপী ধর্মঘট পালিত হয়। পুলিশ এই ধর্মঘট চলাকালে গুলিবর্ষণ করায় ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জে আনুমানিক তিনজনের মৃত্যু হয়।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

সেনাবাহিনী কর্তৃক আটক হয়ে দুই বছর জেলে থাকার পর ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবসহ ৩৫ জন বাঙালি সামরিক ও সিএসপি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে যা ইতিহাসে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে সুপরিচিত। ৬ই জানুয়ারি ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে ২ জন সিএসপি অফিসারসহ ২৮ জনকে জাতীয় স্বার্থবিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। তৎকালীন পাকিস্তান সরকার এই ষড়যন্ত্রকে "আগরতলা ষড়যন্ত্র" নামে অভিহিত করে। এই অভিযোগে ১৮ই জানুয়ারি ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে

শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। মামলায় পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২১ ও ১৩১ ধারা অনুসারে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, শেখ মুজিবসহ এই কর্মকর্তারা ভারতের ত্রিপুরা অঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত আগরতলা শহরে ভারত সরকারের সাথে এক বৈঠকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র করেছে। এতে শেখ মুজিবকে এক নম্বর আসামি করা হয় এবং পাকিস্তান বিভক্তিকরণ ষড়যন্ত্রের মূল হোতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। অভিযুক্ত সকল আসামিকে ঢাকা সেনানিবাসে অন্তরীণ করে রাখা হয়। ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৯শে জুন ঢাকা সেনানিবাসের এক বিশেষ ট্রাইবুনালে এ মামলার শুনানি শুরু হয়। বিচারকার্য চলাকালীন ২৬ জন কৌশলী ছিলেন। শেখ মুজিবের প্রধান কৌশলী ছিলেন আব্দুস সালাম খান। একটি অধিবেশনের জন্য ব্রিটেন থেকে আসেন আইনজীবী টমাস উইলিয়ামস। তাকে সাহায্য করেন তরুণ ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম ও মওদুদ আহমেদ। মামলাটিতে মোট ১০০টি অনুচ্ছেদ ছিল। ১১ জন রাজসাক্ষী ও ২২৭ জন সাক্ষীর তালিকা আদালতে পেশ করা হয়। মামলায় সরকার পক্ষের আইনজীবী ছিলেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মঞ্জুর কাদের, এম আর খান ও মুকসুদুল হাকিম। এর অব্যবহিত পরেই সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। মামলাটিকে মিথ্যা ও বানোয়াট আখ্যায়িত করে সর্বস্তরের জনসাধারণ শেখ মুজিবসহ অভিযুক্ত সকলের মুক্তির দাবিতে রাজপথে নেমে আসেন।

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচারকার্য চলাকালীন ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তাদের এগারো দফা দাবি পেশ করে, তন্মধ্যে শেখ মুজিবের ছয় দফার সবগুলোই অন্তর্ভুক্ত ছিল। উক্ত পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে দেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়। আন্দোলনটি এক পর্যায়ে গণআন্দোলনে রূপ নেয়। পরবর্তীকালে এই গণআন্দোলনই "ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান" নামে পরিচিতি পায়। মাসব্যাপী প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ , ১৪৪ ধারা ভঙ্গ, কারফিউ, পুলিশের গুলিবর্ষণ এবং বেশ কিছু হতাহতের ঘটনার পর আন্দোলন চরম রূপ ধারণ করলে পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খান রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সাথে এক গোলটেবিল বৈঠকের পর এই মামলা প্রত্যাহার করে নেন। একই সাথে শেখ মুজিবসহ অভিযুক্ত সকলকে মুক্তি দেয়া হয়। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঐ বছরেরই ২৩শে ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবের সম্মানে

ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান) এক সভার আয়োজন করে। লাখো জনতার অংশগ্রহণে আয়োজিত এই সম্মেলনে তৎকালীন ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবকে "বঙ্গবন্ধু" উপাধি প্রদান করেন। স্বীয় বক্তৃতায় শেখ মুজিব ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এগার দফা দাবির পক্ষে তার পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন। ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে আইয়ুব খানের আহ্বানে অনুষ্ঠিত একটি সর্বদলীয় সম্মেলনে মুজিব তার ছয় দফাসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের দাবিগুলো উপস্থাপন করেন। কিন্তু, তা প্রত্যাখ্যাত হলে সম্মেলন থেকে বের হয়ে আসেন তিনি। ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক জনসভায় শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানকে "বাংলাদেশ" নামে নামকরণের ঘোষণা দেন। মুজিবের এই ঘোষণার ফলে সারাদেশে ব্যাপক গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে। পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিবিদ এবং সামরিক কর্মকর্তারা তাকে একজন বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হিসেবে মূল্যায়ন করতে শুরু করেন। মুজিবের বাঙালি সংস্কৃতি ও জাতিগত আত্মপরিচয়ের বহিঃপ্রকাশ প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের বিতর্কে নতুন মাত্রা এনে দেয়। অনেক বুদ্ধিজীবীদের মতে, যে দ্বিজাতি তত্ত্বের মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে, বাঙালিদের আন্দোলন দ্বিজাতি তত্ত্বকে অস্বীকার করার নামান্তর। বাঙালিদের জাতিগত ও সংস্কৃতিগত এই আত্মপরিচয় তাদেরকে একটি আলাদা জাতিসত্তা প্রদানে সাহায্য করে। তবে মুজিব পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক জনমত গড়ে তুলতে সমর্থ হন এবং ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ কার্যত ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন।

৭০-এর সাধারণ নির্বাচন

গণঅভ্যুত্থানের বিরূপ প্রভাবে ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে মার্চ আইয়ুব খান রাষ্ট্রপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন। ২৫শে মার্চ ইয়াহিয়া খান উক্ত পদে আসীন হন। তিনি ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ এক ঘোষণায় পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি দেন। ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই নভেম্বর ভোলায় ঘূর্ণিঝড়ের কারণে প্রায় ১ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয় এবং ১০ লক্ষ মানুষ বাস্তুহারা হয়ে পড়ে। এতে জনগণ পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের দুর্বল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রতি চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেন। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকার এটিকে 'স্থানীয় নেতাদের ব্যর্থতা' হিসেবে উল্লেখ করে। এসময় শেখ মুজিব বাস্তুহারাদের মাঝে ত্রাণ সহায়তা পৌঁছাতে থাকেন। ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যক্রমের জন্য নির্বাচনের সময়সূচি পিছিয়ে দেয়া হয়। পরে ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর (জাতীয়) ও ১৭ই ডিসেম্বর (প্রাদেশিক) "এক

ব্যক্তির এক ভোটের ভিত্তিতে" নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সময় জাতীয় পরিষদে সদস্য সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন। তন্মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ১৬৯ জন এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ১৪৪ জন প্রতিনিধি থাকতেন। ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ জাতীয় ও প্রাদেশিক আইনসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দকৃত ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসনে বিজয়ী হয়। পূর্ব পাকিস্তানের ২টি আসন ছাড়া বাকি সবগুলোতে জয়ী হওয়ায় জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাও অর্জন করে আওয়ামী লীগ। ১৭ই ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক নির্বাচনের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে। নির্বাচনের ফলাফল পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে মেরুকরণ সৃষ্টি করে। পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের নেতা জুলফিকার আলি ভুট্টো, মুজিবের স্বায়ত্বশাসনের নীতির প্রবল বিরোধিতা করেন। ভুট্টো অধিবেশন বয়কট করার হুমকি দিয়ে ঘোষণা দেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান মুজিবকে সরকার গঠনের জন্য আহ্বান জানালে তিনি ঐ সরকারকে মেনে নেবেন না। অধিকাংশ পশ্চিম পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তা ও ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলো শেখ মুজিবের আসন্ন প্রধানমন্ত্রীত্ব লাভের প্রবল বিরোধিতা করে। এসময় শেখ মুজিব কিংবা আওয়ামী লীগের কেউই পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথা চিন্তা করেননি, যদিও কিছুসংখ্যক জাতীয়তাবাদী দল বাংলাদেশের স্বাধীনতা দাবি করতে থাকে। জুলফিকার আলি ভুট্টো গৃহযুদ্ধের ভয়ে শেখ মুজিব ও তার ঘনিষ্ঠজনদেরকে নিজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসার জন্য একটি গোপন বার্তা পাঠান। পাকিস্তান পিপলস পার্টির মুবাশির হাসান শেখ মুজিবকে ভুট্টোর সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠনে প্ররোচনা দেন; যেখানে শেখ মুজিব হবেন প্রধানমন্ত্রী এবং ভুট্টো থাকবেন রাষ্ট্রপতি। সেনাবাহিনীর সকল সদস্যের অগোচরে সম্পূর্ণ গোপনে এই আলোচনা সভাটি পরিচালিত হয়। একইসময়ে, ভুট্টো আসন্ন সরকার গঠনকে বানচাল করার জন্য ইয়াহিয়া খানের উপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন।

৭ই মার্চের ভাষণ

আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও সামরিক শাসকগোষ্ঠী দলটির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে বিলম্ব করতে শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে তাদের উদ্দেশ্য ছিল, যে-কোনভাবে ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিবিদদের হাতে কুক্ষিগত করে রাখা। এরূপ পরিস্থিতিতে ১৪ ফেব্রুয়ারি

তারিখে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খান ৩রা মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। কিন্তু তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে ১লা মার্চ উক্ত অধিবেশনটি অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি ঘোষণা করেন। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা বুঝতে পারে, মুজিবের দলকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও সরকার গঠন করতে দেয়া হবে না। এই সংবাদে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ২রা মার্চ ঢাকায় এবং ৩রা মার্চ সারাদেশে একযোগে হরতাল পালিত হয়। তিনি ৩রা মার্চ পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক বিশাল জনসভায় সমগ্র পূর্ব বাংলায় সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ৬ই মার্চ এক বেতার ভাষণে ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করে সকল প্রকার দোষ তার উপর চাপিয়ে দেয়ার প্রয়াস চালান। এ ধরনের ঘোলাটে পরিস্থিতিতেই ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় বিপুলসংখ্যক লোক একত্রিত হয়। সাধারণ জনতা এবং সার্বিকভাবে সমগ্র জাতির উদ্দেশ্যে শেখ মুজিবুর রহমান তার সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। তিনি ঘোষণা দেন-

"... রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ্। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।"

এর কয়েক ঘণ্টা পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার গণমাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমানের এই ভাষণ সরাসরি সম্প্রচারে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। সেনাবাহিনীর চাপ থাকা সত্ত্বেও ইএমআই মেশিন ও টেলিভিশন ক্যামেরায় ভাষণের অডিও এবং ভিডিও চিত্র ধারণ করে রাখা হয়। ৮ই মার্চ জনতার চাপে ও পাকিস্তান রেডিও'র কর্মকর্তাদের কর্মবিরতির কারণে পাকিস্তান সরকার বেতারে এই ভাষণ পুনঃপ্রচারের অনুমতি দিতে বাধ্য হয়।

ইয়াহিয়া-মুজিব-ভুট্টো বৈঠক

১০ই মার্চ নির্বাচিত ১২ জন সংসদীয় শীর্ষস্থানীয় নেতাকে ইয়াহিয়া খান বৈঠকের আমন্ত্রণ জানালে শেখ মুজিব তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং ১৫ই মার্চ অসহযোগ আন্দোলনের জন্য সুনির্দিষ্ট ৩৫টি নির্দেশনা জারি করেন। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন এবং ১৬ই মার্চ শেখ মুজিবের সঙ্গে সরকার গঠন ও ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে আলোচনা শুরু করেন। কিন্তু একই সঙ্গে সামরিক বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যা চালানোর পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে।

সেনাবাহিনীর জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে ঢাকায় প্রেরণের পাশাপাশি সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র পাঠানো চলমান থাকে। ১৯শে মার্চ ইয়াহিয়া-মুজিব তৃতীয় দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ২১শে মার্চ আলোচনায় যোগ দিতে জুলফিকার আলী ভুট্টো ১২ জন উপদেষ্টাকে সফরসঙ্গী করে ঢাকা আসেন। ২২শে মার্চ ভুট্টো-মুজিবের ৭০ মিনিটের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অনেক আশাবাদ ব্যক্ত করা সত্ত্বেও ভুট্টো-মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক সফল হয়নি। পূর্ব পাকিস্তানে ২৩শে মার্চ প্রতিরোধ দিবস পালন করা হয়। ২৫শে মার্চ ভুট্টো-ইয়াহিয়া রুদ্ধদ্বার বৈঠকের পর ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীকে বাঙালি নিধনযজ্ঞের সবুজ সংকেত অপারেশন সার্চলাইট প্রদান করে সন্ধ্যায় গোপনে পশ্চিম পাকিস্তান যাত্রা করেন। উইং কমান্ডার এ. কে. খন্দকার শেখ মুজিবকে বিষয়টি জানান। ২৫শে মার্চ রাত ১২টা ২০ মিনিটে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ঐদিনই রাত ১টা ১০ মিনিটে তাকে গ্রেফতার করে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হয়।

কারাভোগ

শেখ মুজিবুর রহমান তার রাজনৈতিক জীবনে ৪ হাজার ৬৮২ দিন কারাভোগ করেছেন। তন্মধ্যে বিদ্যালয়ের ছাত্র অবস্থায় ব্রিটিশ আমলে সাত দিন কারাভোগ করেন। বাকি ৪ হাজার ৬৭৫ দিন তিনি কারাভোগ করেন পাকিস্তান সরকারের আমলে। শেখ মুজিবুর রহমান তার জীবনের প্রায় ১৩ বছর কারাগারে ছিলেন। ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে গোপালগঞ্জ হিন্দু মহাসভার সভাপতি সুরেন ব্যানার্জির বাড়িতে সহপাঠী বন্ধু আবদুল মালেককে মারপিট করা হলে শেখ মুজিবুর রহমান সেই বাড়িতে গিয়ে ধাওয়া করেন। সেখানে হাতাহাতির ঘটনা ঘটলে হিন্দু মহাসভার নেতাদের কৃত মামলায় শেখ মুজিবকে প্রথমবারের মতো আটক করা হয়। সাত দিন জেলে থাকার পর মীমাংসার মাধ্যমে মামলা তুলে নেওয়া হলে শেখ মুজিব মুক্তি পান। এছাড়া ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে অল বেঙ্গল মুসলিম ছাত্রলীগের ফরিদপুর জেলা শাখার সহসভাপতি থাকা অবস্থায় বক্তব্য প্রদান এবং গোলযোগের সময় সভাস্থলে অবস্থান করায় শেখ মুজিবুর রহমানকে দুইবার সাময়িকভাবে গ্রেফতার করা হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর শেখ মুজিব ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই মার্চ থেকে ১৫ই মার্চ পর্যন্ত পাঁচ দিন কারাগারে ছিলেন। একই বছর ১১ই সেপ্টেম্বর আটক হয়ে মুক্তি পান ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারি। এ দফায় তিনি ১৩২ দিন কারাভোগ করেন। এরপর ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল আবারও তাকে কারাগারে নিয়ে

যাওয়া হয় ও ৮০ দিন কারাভোগ করে ২৮শে জুন মুক্তি পান। ওই দফায় তিনি ২৭ দিন কারাভোগ করেন। একই বছরের অর্থাৎ ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর থেকে ২৭শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬৩ দিন এবং ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি থেকে ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারি টানা ৭৮৭ দিন কারাগারে ছিলেন। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করার পরও শেখ মুজিবকে ২০৬ দিন কারাভোগ করতে হয়। ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে আইয়ুব খান সামরিক আইন জারির পর ১১ই অক্টোবর শেখ মুজিব আবার গ্রেফতার হন। এ সময়ে টানা ১ হাজার ১৫৩ দিন তাকে কারাগারে কাটাতে হয়। এরপর ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারি আবারও গ্রেফতার হয়ে মুক্তি পান ওই বছরের ১৮ই জুন। এ দফায় তিনি কারাভোগ করেন ১৫৮ দিন। এরপর ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে বিভিন্ন মেয়াদে তিনি ৬৬৫ দিন কারাগারে ছিলেন। ছয় দফা প্রস্তাব দেয়ার পর তিনি যেখানে সমাবেশ করতে গেছেন, সেখানেই গ্রেফতার হয়েছেন। ওই সময়ে তিনি ৩২টি জনসভা করে বিভিন্ন মেয়াদে ৯০ দিন কারাভোগ করেন। এরপর ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই মে আবারও গ্রেফতার হয়ে ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারি গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে মুক্তি পান। এ সময় তিনি ১ হাজার ২১ দিন কারাগারে ছিলেন। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার পরপরই পাকিস্তান সরকার তাকে গ্রেফতার করে। এ দফায় তিনি কারাগারে ছিলেন ২৮৮ দিন।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা

স্বাধীনতার ঘোষণা

১৯৭১ ইয়াহিয়া খান ২৭ মার্চ পাকিস্তান রেডিওতে এক ঘোষণায় সামরিক আইন জারি করেন, আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং মুজিবসহ আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতাকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী রাজনৈতিক ও জনসাধারণের অসন্তোষ দমনে ২৫শে মার্চ অপারেশন সার্চলাইট শুরু করে। সামরিক বাহিনীর অভিযান শুরু হলে মুজিব ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ধানমন্ডির ৩২ নং বাড়ি থেকে ওয়্যারলেসের মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করা হয়। মূল ঘোষণার অনুবাদ নিম্নরূপ:

"এটাই হয়ত আমার শেষ বার্তা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের মানুষকে আহ্বান জানাই, আপনারা যেখানেই থাকুন, আপনাদের সর্বস্ব দিয়ে দখলদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ চালিয়ে যান।

বাংলাদেশের মাটি থেকে সর্বশেষ পাকিস্তানি সৈন্যটিকে উৎখাত করা এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের আগ পর্যন্ত আপনাদের যুদ্ধ অব্যাহত থাকুক। জয় বাংলা।"

এর কিছুক্ষণ পর তিনি বাংলায় একটি ঘোষণা পাঠানোর ব্যবস্থা করেন-

"সর্ব শক্তিমান আল্লাহর নামে আপনাদের কাছে আমার আবেদন ও আদেশ, দেশকে স্বাধীন করার জন্য শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। আপনাদের পাশে এসে যুদ্ধ করার জন্য পুলিশ, ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট আনসারদের সাহায্য চান। কোন আপাষে নাই। জয় আমাদের হবেই। পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শেষ শত্রু বিতাড়িত করুন। সকল আওয়ামী লীগ নেতা কর্মী এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক লাকেদের কাছে এই সংবাদ পৌঁছে দিন। আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুন। জয় বাংলা।"

টেক্সাসে বসবাসরত মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত নথি সংগ্রাহক মাহবুবুর রহমান জালাল বলেন, "বিভিন্ন সূত্র ও দলিল থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী এটিই প্রমাণিত হয় যে, ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান, যা ছিল তার বা অন্য কারো হয়ে ঘোষণা দেওয়ার অনেক পূর্বে।"

স্বাধীনতা ঘোষণার পরই রাত ১টা ৩০ মিনিটের সময় শেখ মুজিবকে সেনাবাহিনীর একটি দল তার বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে ও সামরিক জিপে তুলে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হয়। ঐ রাতে তাকে আটক রাখা হয় আদমজী ক্যান্টনমেন্ট স্কুলে। পরদিন তাকে অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে বিমানে করে করাচিতে প্রেরণ করা হয়। করাচি বিমানবন্দরে পেছনে দাঁড়ানো দুই পুলিশ কর্মকর্তার সামনের আসনে বসা অবস্থায় শেখ মুজিবের ছবি পরদিন প্রায় সব দৈনিক পত্রিকার প্রথম পাতায় ছাপা হয়। এর আগে জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে শেখ মুজিবকে ক্ষমতালোলুপ দেশপ্রেম বর্জিত লোক আখ্যা দিয়ে দেশের ঐক্য ও সংহতির ওপর আঘাত হানা এবং ১২ কোটি মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অভিযোগ তোলেন ও বলেন যে এই অপরাধের শাস্তি তাকে (শেখ মুজিবকে) পেতেই হবে।

মুক্তিযুদ্ধ ও বন্দিজীবন

লাহোর থেকে ৮০ মাইল দূরে পাকিস্তানের উষ্ণতম শহর লায়ালপুরের (বর্তমান ফয়সালাবাদ) কারাগারে শেখ মুজিবকে কড়া নিরাপত্তায় আটকে রাখা হয়। তাকে

নিঃসঙ্গ সেলে (সলিটারি কনফাইন্টমেন্ট) রাখা হয়েছিল। এদিকে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিলে তৎকালীন কুষ্টিয়া জেলার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে (বর্তমানে মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর) বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সরকারের রাষ্ট্রপতি ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তার অনুপস্থিতিতে মুজিবনগর সরকারের উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও সশস্ত্র বাহিনীর অস্থায়ী সর্বাধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাজউদ্দিন আহমেদ হন প্রধানমন্ত্রী। পূর্ব পাকিস্তানে মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী বড় রকমের বিদ্রোহ সংঘটিত করে। মুক্তিবাহিনী ও পাকিস্তান বাহিনীর মধ্যকার সংঘটিত যুদ্ধটিই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ নামে পরিচিত। ১৯শে জুলাই পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ সামরিক আদালতে মুজিবের আসন্ন বিচারের বার্তা গণমাধ্যমে প্রকাশ করে। পাকিস্তানি জেনারেল রহিমুদ্দিন খান এই আদালতের নেতৃত্ব দেন। তবে মামলার প্রকৃত কার্যপ্রণালী ও রায় কখনোই জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি। লায়ালপুর কারাগারে সামরিক আদালত গঠন করা হয়। তাই মামলাটি "লায়ালপুর ট্রায়াল" হিসেবে অভিহিত। এই মামলার শুরুতে সরকারের দিক থেকে প্রবীণ সিন্ধি আইনজীবী এ. কে. ব্রোহিকে অভিযুক্তের পক্ষে মামলা পরিচালনায় নিয়োগ দেয়া হয়। আদালতের কার্যক্রমের শুরুতে ১২ দফা অভিযোগনামা পড়ে শোনানো হয়। অভিযোগের মধ্যে ছিল-রাষ্ট্রদ্রোহ, সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ইত্যাদি। ছয়টি অপরাধের জন্য শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। আদালতে ইয়াহিয়া খানের ২৬শে মার্চ প্রদত্ত ভাষণের টেপ রেকর্ডিং বাজিয়ে শোনানো হয়। সেই বক্তব্য শোনার পর শেখ মুজিব আদালতের কোনো কার্যক্রমে অংশ নেওয়া এবং তার পক্ষে কৌঁসুলি নিয়োগে অস্বীকৃতি জানান। তিনি এই বিচারকে প্রহসন আখ্যা দেন। গোটা বিচারকালে তিনি কার্যত আদালতের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসেছিলেন। আদালত কক্ষে যা কিছু ঘটেছে, তা তিনি নিস্পৃহভাবে বরণ করেছিলেন। বিচার প্রক্রিয়ায় আত্মপক্ষ সমর্থন তো দূরের কথা, কোনো কার্যক্রমেই অংশ নেননি তিনি। ৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তান বিমানবাহিনী ভারতের কয়েকটি সামরিক বিমানঘাঁটি আক্রমণ করলে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়। পরদিন, ৪ঠা ডিসেম্বর সামরিক আদালত বিচারের রায় ঘোষণা করে। শেখ মুজিবুর রহমানকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। আদালতের কার্যক্রম শেষে তাকে নেওয়া হয় মিয়ানওয়ালি শহরের আরেকটি কারাগারে। সেখানে দণ্ডাদেশ কার্যকর করার ব্যবস্থা চলতে থাকে। বলা হয়ে থাকে, যে কারাগার কক্ষে তিনি অবস্থান করেছিলেন, তার পাশে একটি কবরও খোঁড়া হয়েছিল। তবে দ্রুত পরিবর্তনশীল

যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। আন্তর্জাতিক চাপ থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানি সরকার মুজিবকে ছেড়ে দিতে এবং তার সাথে সমঝোতা করতে অস্বীকৃতি জানায়। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে যুদ্ধে ভারতের সরাসরি অংশগ্রহণের ফলে ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনীকে নিয়ে গড়া যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ঢাকায় ফিরে সরকার গঠন করেন।

কারামুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী বাংলাদেশের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয়বরণ করার ফলশ্রুতিতে ২০শে ডিসেম্বর ইয়াহিয়া খান ক্ষমতাচ্যুত হলে জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব নেন। ক্ষমতা হস্তান্তরকালেও ইয়াহিয়া খান জুলফিকার আলী ভুট্টোর কাছে মুজিবকে মৃত্যুদণ্ড দিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু ভুট্টো নিজের স্বার্থ, বাংলাদেশে আটকে পড়া পাকিস্তানিদের পরিণতি ও আন্তর্জাতিক চাপের কথা চিন্তা করে শেখ মুজিবের কোন ক্ষতি করতে চাননি। শেখ মুজিবের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে রাষ্ট্রপতি জুলফিকার আলী ভুট্টো তাকে কারাগার থেকে দ্রুত নিরাপদ কোন স্থানে সরিয়ে ফেলতে চান এবং মিঁয়াওয়ালী কারাগারের প্রধান হাবিব আলীকে সেরূপ আদেশ দিয়ে জরুরি বার্তা প্রেরণ করেন। ২২শে ডিসেম্বর শেখ মুজিবুর রহমানকে মিঁয়াওয়ালী কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং একটি অজ্ঞাত স্থানে গৃহবন্দি করে রাখা হয়। এরপর ২৬শে ডিসেম্বর সিহালার পুলিশ রেস্ট হাউজে নিয়ে যাওয়া হয়। ভুট্টো ঐদিন সেখানে শেখ মুজিবের সাথে দেখা করেন। ডিসেম্বরের শেষের দিকে (২৯ অথবা ৩০ ডিসেম্বর) পাকিস্তানের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আজিজ আহমেদের সাথে এবং ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারি রাওয়ালপিন্ডিতে আবার ভুট্টোর সাথে মুজিবের বৈঠক হয়। ভুট্টো তাকে পশ্চিম পাকিস্তান ও নবগঠিত বাংলাদেশের সাথে ন্যূনতম কোন "লুস কানেকশন" রাখার অর্থাৎ শিথিল কনফেডারেশন গঠন করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু শেখ মুজিব ঢাকায় এসে জনগণের মতামত না জেনে কোন প্রকার প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকার করেন।

১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারি ভুট্টো শেখ মুজিবের পাকিস্তান ত্যাগের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হন। সেদিন রাত ২টায় অর্থাৎ ৮ই জানুয়ারির প্রথম প্রহরে শেখ মুজিবুর রহমান ও ড. কামাল হোসেনকে নিয়ে পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সের একটি কার্গো বিমান লন্ডনের উদ্দেশ্যে রাওয়ালপিন্ডি ছাড়ে। ভুট্টো নিজে বিমানবন্দরে এসে

শেখ মুজিবকে বিদায় জানান। লন্ডনে তিনি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এরপর তিনি লন্ডন থেকে নয়াদিল্লিতে ফিরে আসেন এবং ভারতীয় রাষ্ট্রপতি ভি. ভি. গিরি ও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাতের পর জনসমক্ষে ইন্দিরা গান্ধী ও "ভারতের জনগণ আমার জনগণের শ্রেষ্ঠ বন্ধু" বলে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি দুপুর ১টা ৪১ মিনিটে বাংলাদেশে ফিরে আসেন। বিমানবন্দর থেকে সরাসরি রেসকোর্স ময়দানে এসে তিনি সেদিন প্রায় পাঁচ লাখ মানুষের সামনে বক্তৃতা দেন।

বাংলাদেশ শাসন

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর শেখ মুজিবুর রহমান অল্পদিনের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে পাকিস্তান আইনসভার জন্য নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারি তারিখে নতুন রাষ্ট্রের প্রথম সংসদ গঠন করেন। ১২ই জানুয়ারি সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করে তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নিকট হস্তান্তর করেন।

সংবিধান প্রণয়ন

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরপরই শেখ মুজিবুর রহমান তার অন্তর্বর্তী সংসদকে একটি নতুন সংবিধান রচনার দায়িত্ব দেন। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে শেখ মুজিব স্বাক্ষর করেন। ১৫ই ডিসেম্বর শেখ মুজিব সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় খেতাব প্রদানের ঘোষণা দেন। ১৬ই ডিসেম্বর থেকে নতুন সংবিধান কার্যকর করা হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রওনক জাহানের মতে, 'শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক চিন্তাধারার চারটি বৈশিষ্ট্য হলো, বাঙালি জাতিসত্তা, সমাজতন্ত্র, জনসম্প্রীতি এবং অসাম্প্রদায়িকতা। সংবিধানের চারটি মূলনীতি-জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার মাধ্যমে চারটি বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এই চারটি মূলনীতিকে একসাথে মুজিববাদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।'

৭ই মার্চ, ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ নির্বাচনে শেখ মুজিব ও তার দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। শেখ মুজিব ঢাকা-১২ আসন থেকে নির্বাচিত হয়ে পুনরায় প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচিত সরকার গঠন করেন।

নবরাষ্ট্র পুনর্গঠন

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পরিচালিত নয় মাসব্যাপী ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের পর সমগ্র বাংলাদেশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। শেখ মুজিব এই ধ্বংসযজ্ঞকে "মানব ইতিহাসের জঘন্যতম ধ্বংসযজ্ঞ" হিসেবে উল্লেখ করে ৩০ লাখ মানুষ নিহত ও ২ লাখ নারীর ধর্ষিত হওয়ার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে শেখ মুজিব মাত্র এক বছরের মধ্যে দেশ পুনর্গঠনের জন্য উল্লেখযাগ্যে কর্মসূচি হাতে নেন। প্রশাসনিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন, সংবিধান প্রণয়ন, এক কোটি মানুষের পুনর্বাসন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাথমিক শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে এবং মাধ্যমিক শ্রেণি পর্যন্ত নামমাত্র মূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন, ১১,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ ৪০,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণ, দুঃস্থ মহিলাদের কল্যাণের জন্য নারী পুনর্বাসন সংস্থা, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য মুক্তিযাদ্ধো কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন, ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ, বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে কৃষকদের মধ্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ, পাকিস্তানিদের পরিত্যক্ত ব্যাংক, বীমা এবং ৫৮০টি শিল্প ইউনিটের জাতীয়করণ ও চালু করার মাধ্যমে হাজার হাজার শ্রমিক কর্মচারীর কর্মসংস্থান, ঘোড়াশাল সার কারখানা, আশুগঞ্জ কমপ্লেক্সের প্রাথমিক কাজ ও অন্যান্য নতুন শিল্প স্থাপন, বন্ধ শিল্প-কারখানা চালুকরণসহ অন্যান্য সমস্যা মোকাবেলাপূর্বক একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবকাঠামো তৈরি করে দেশকে ধীরে ধীরে একটি সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রয়াস চালান।

শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে আঁতাতের অভিযোগে ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে নিষিদ্ধ ঘোষিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুনরায় চালু করেন। ইসলামি গোত্রগুলোর জোর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে মদ তৈরি ও বিপণন এবং জুয়া খেলা নিষিদ্ধ করেন। তার শাসনে অসন্তুষ্ট ডানপন্থী সমাজতান্ত্রিক দলগুলোর সমর্থন পেতে তিনি সন্দেহভাজন যুদ্ধাপরাধীদের প্রতি শর্তসাপেক্ষে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর সাধারণ ক্ষমার ঘোষণায় তিনি "মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানকে সহায়তাকারী দালালেরা" তাদের ভুল বুঝতে পেরে দেশের উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করবে বলে আশা প্রকাশ করেন এবং দালাল

অধ্যাদেশে আটক ও সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের ১৬ই ডিসেম্বরের মধ্যে মুক্তি দেওয়ার ঘোষণা দেন। তবে হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, বাড়িঘর পোড়ানো ও বিস্ফোরক ব্যবহারে ক্ষতিসাধনের জন্য দোষী সাব্যস্ত অপরাধীদের সাধারণ ক্ষমার আওতায় আনা হয়নি। অত্যন্ত অল্প সময়ে বিশ্বের প্রায় সব রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায় ও ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্যপদ লাভ ছিল শেখ মুজিব সরকারের উল্লেখযাগ্যে সাফল্য।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেয়া হয়। ১০০ বিঘার বেশি জমির মালিকদের জমি এবং নতুন চর বিনামূল্যে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। গ্রাম বাংলার ঋণে জর্জরিত কৃষকদের মুক্তির জন্য তিনি "খাই-খালাসী আইন" পাশ করেন। গ্রাম বাংলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ও শিল্প-কৃষি উৎপাদনের জন্য পল্লী বিদ্যুৎ উন্নয়ন বার্ডে প্রতিষ্ঠা করেন। শেখ মুজিবুর রহমান স্থানীয় সরকারগুলোতে গণতন্ত্রায়নের সূচনা করেন। তিনি ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভায় প্রত্যক্ষ ভাটে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। এর ফলে প্রশাসনে জনগণ সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে। ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি নাগাদ ১৩ মাসে ১০ কোটি টাকা তাকাবি ঋণ বণ্টন, ৫ কোটি টাকার সমবায় ঋণ প্রদান, কৃষিক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন, ১০ লাখ বসতবাড়ি নির্মাণ, চীনের কয়েক দফা ভেটো সত্ত্বেও জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ, ৩০ কোটি টাকার ত্রাণসামগ্রী বিতরণ, ২রা ফেব্রুয়ারি থেকে মিত্রবাহিনীর সৈন্য প্রত্যাবর্তন শুরুসহ দেশের সাধারণ মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে শেখ মুজিব বিশাল কর্মযজ্ঞের আয়াজেন করেন। মুজিব শতাধিক পরিত্যক্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও কোম্পানি রাষ্ট্রীয়করণ করেন এবং ভূমি ও মূলধন বাজেয়াপ্ত করে ভূমি পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে কৃষকদের সাহায্যের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধকালে ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী প্রায় ১ কোটি শরণার্থীর পুনর্বাসনের জন্য বড় ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হয়। এরফলে, অর্থনৈতিক সঙ্কটের অবসান হতে শুরু করে এবং সমূহ দুর্ভিক্ষ এড়ানো সম্ভব হয়। এছাড়াও তিনি প্রাথমিক শিক্ষা, খাদ্য, স্বাস্থ্য, পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি ঘটান। শেখ মুজিবের নির্দেশে ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ২১শে জুন সকল মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করে পূর্বের ১৯টি বৃহত্তর জেলার স্থলে ৬১টি জেলা সৃষ্টি করা হয়। ১৬ই জুলাই শেখ মুজিব ৬১ জেলার প্রতিটির জন্য একজন করে গভর্নর নিয়োগ দেন।

অর্থনৈতিক নীতি

নব নির্বাচিত মুজিব সরকার গুরুতর কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়, তন্মধ্যে ছিল- ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর পুনর্বাসন, খাদ্য ও স্বাস্থ্যসেবা উপকরণ সরবরাহ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়াবলি। এছাড়া ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব এবং যুদ্ধের ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাও চরমভাবে ভেঙে পড়েছিল। অর্থনৈতিকভাবে মুজিব একটি বিস্তৃত পরিসরের জাতীয়করণ কার্যক্রম হাতে নেন। বছর শেষ হতে না হতেই, হাজার হাজার বাঙালি পাকিস্তান থেকে চলে আসে ও হাজার হাজার অবাঙালি পাকিস্তানে অভিবাসিত হয়। তা সত্ত্বেও হাজার হাজার মানুষ শরণার্থী শিবিরগুলোতে রয়ে যায়। প্রায় ১ কোটি শরণার্থীকে পুনর্বাসন করার জন্য বৃহৎ সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। পর্যায়ক্রমে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হতে থাকে এবং দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ হওয়ার আশঙ্কাকে প্রতিহত করা সম্ভব হয়। ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রণীত বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় (১৯৭৩-১৯৭৮) কৃষি, গ্রামীণ অবকাঠামো ও কুটির শিল্প উন্নয়নে প্রাধিকারমূলক সরকারি অর্থ বরাদ্দের নির্দেশ দেয়া হয়। তারপরও ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে চালের দাম আকস্মিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হয়, যা ১৯৭৪-এর দুর্ভিক্ষ নামে পরিচিত। উক্ত দুর্ভিক্ষের সময় রংপুর জেলায় খাদ্যাভাব ছড়িয়ে পড়ে। সরকারের অব্যবস্থাপনাকে সেসময় এর জন্যে দোষারোপ করা হয়। মুজিবের শাসনামলে দেশবাসী শিল্পের অবনতি, বাংলাদেশি শিল্পের উপর ভারতের নিয়ন্ত্রণ এবং জাল টাকা কেলেঙ্কারি প্রত্যক্ষ করে।

পররাষ্ট্রনীতি

চার বছরের কম সময়ে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়নে যে সাফল্য এনেছেন, তা বাংলাদেশের ইতিহাসে অদ্বিতীয় হয়ে আছে। যেসব দেশ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল, তাদের সঙ্গেও তিনি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। এমনকি পাকিস্তানের স্বীকৃতিও আদায় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। "কারো সাথে বৈরিতা নয়, সকলের সাথে বন্ধুত্ব" ছিল মুজিব সরকারের পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসের মধ্যেই বাংলাদেশ ১১৩টি দেশের স্বীকৃতি লাভ করে। শেখ মুজিবের সিদ্ধান্তক্রমে বাংলাদেশ অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্স ও ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের

সদস্যপদ গ্রহণ করে। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে স্বীকৃতি লাভের পর শেখ মুজিব পাকিস্তানের স্বীকৃতি এবং ওআইসি, জাতিসংঘ ও জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনে বাংলাদেশের সদস্যপদ নিশ্চিত করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে ভ্রমণ করে বাংলাদেশের জন্য মানবীয় ও উন্নয়নকল্পের জন্য সহযোগিতা চান।

১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে শেখ মুজিব প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের সাথে ২৫ বছর মেয়াদী মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করেন যাতে অর্থনৈতিক ও মানব সম্পদ উন্নয়নে ব্যাপক সাহায্যের আশ্বাস দেয়া হয়। চুক্তিতে বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনী ও সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের শর্ত অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে মুজিব ইন্দিরা গান্ধীর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখেন। মুজিবের জীবদ্দশায় দুই সরকারের মধ্যে পারস্পরিক আন্তরিকতাপূর্ণ সমঝোতা ছিল। শেখ মুজিবের অনুরোধক্রমে ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের ভূখণ্ড থেকে ভারতীয় বাহিনীকে নিজ দেশে ফেরৎ নিয়ে যান। ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোট-নিরপেক্ষ দেশসমূহের শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেন। পরবর্তীকালে শেখ মুজিবুর রহমান সোভিয়েত ইউনিয়নে রাষ্ট্রীয় সফরে যান। দেশটির শীর্ষ চার নেতা পোদগর্নি, কোসিগিন, ব্রেজনেভ ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রেই গ্রোমিকো তাকে অভ্যর্থনার জন্য ক্রেমলিনে সমবেত হন। ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি জাপান সফর করেন। জাপানের সম্রাট হিরোহিতো শেখ মুজিবকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান।

১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ২৩শে ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিব লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামি সম্মেলন সংস্থার সম্মেলনে যোগ দেন। উক্ত সম্মেলনে মুজিব তার চরম প্রতিদ্বন্দ্বী জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন যা পাকিস্তানের সাথে কিছুমাত্রায় সম্পর্ক উন্নয়ন ও স্বীকৃতি পেতে সহায়তা করে। তিনি একই বছরের ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করেন এবং সেখানে জাতিসংঘের ইতিহাসে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দেন। বক্তৃতায় তিনি ৫০টি সমস্যার পাশাপাশি বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরেন।

সামরিক বাহিনী গঠন

শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ বিমানবাহিনী ও বাংলাদেশ নৌবাহিনী গড়ে ওঠে। নবগঠিত রাষ্ট্রের স্বাধীনতা

রক্ষাকল্পে তিনি সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য বিস্তৃত প্রকল্প গ্রহণ করেন। শেখ মুজিব খাদ্য ক্রয়ের পাশাপাশি বিদেশ থেকে সেনাবাহিনীর জন্য প্রয়াজেনীয় অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করেন। যুগোস্লাভিয়ায় সামরিক প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে পদাতিক বাহিনীর জন্য ক্ষুদ্র অস্ত্রশস্ত্র এবং সাজোঁয়া বাহিনীর জন্য ভারি অস্ত্র আনা হয়। ভারতের অনুদানে ৩০ কোটি টাকায় সেনাবাহিনীর জন্য কেনা হয় কাপড় ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে তৎকালে উপমহাদেশের সবচেয়ে আধুনিক আকাশযান মিগ বিমান, হেলিকপ্টার ও পরিবহন বিমান সংগ্রহ করা হয়। এছাড়াও শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফলে মিশর থেকে সাঁজোয়া গাড়ি বা ট্যাংক আনা সম্ভব হয়েছিল। উন্নত প্রযুক্তি ও উন্নত জ্ঞান লাভ করে দেশ যাতে আধুনিক সেনাবাহিনী গড়তে পারে সে উদ্দেশ্যে শেখ মুজিব সামরিক কর্মকর্তাদেরকে প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে প্রেরণ করেন। সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা ব্রিটেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারত প্রভৃতি দেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে শেখ মুজিব সরকার সেনাবাহিনীর জন্য নগদ অর্থে আধুনিক বেতারযন্ত্র ক্রয় করে এবং সিগন্যাল শাখাকে আরও আধুনিক করে গড়ে তালেন। শেখ মুজিব পাকিস্তান থেকে প্রত্যাবর্তনকারী ত্রিশ হাজারের অধিক সামরিক কর্মকর্তা ও জওয়ানদেরকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে পুনর্বাসিত করেন। প্রত্যাবর্তনকারী বাঙালি কর্মকর্তার সংখ্যা ছিল প্রায় ১৩০০। এই সকল কর্মকর্তা ও জওয়ানদের নিয়ে অর্ধ লক্ষের অধিক সদস্যের দেশের প্রথম সেনাবাহিনী গড়ে উঠেছিল। সামরিক সুবিধা বৃদ্ধি করার জন্য শেখ মুজিবের নির্দেশে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে দীঘিনালা, রুমা, আলীকদমের ন্যায় স্থানে ৩টি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ছাউনি গড়ে তোলা হয়।

জাতীয় রক্ষীবাহিনী

শেখ মুজিবের ক্ষমতালাভের পরপরই জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সশস্ত্র বিভাগ গণবাহিনী কর্তৃক সংগঠিত বামপন্থী বিদ্রোহীরা মাওবাদী সরকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য মুজিব সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে। গৃহযুদ্ধ ও রাজনৈতিক অস্থিরতা রোধে শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি দেশে প্রত্যাবর্তন করে ক্ষমতা গ্রহণের পর ২৪শে জানুয়ারি বাংলাদেশ সরকার জাতীয় মিলিশিয়া গঠনের ব্যাপারে একটি আদেশ জারি করেন। এরপর ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠনের সরকারি আদেশ জারি করা হয়।

রক্ষীবাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল সেনাবাহিনীর এক-ষষ্ঠাংশ। শুরুর দিকে রক্ষীবাহিনী বেশ কিছু কার্যকর পদক্ষেপ নিয়ে অনেক অস্ত্রশস্ত্র, চোরাচালানের মালামাল উদ্ধার করে এবং মজুতদার ও কালোবাজারীদের কার্যকলাপ কিছুটা প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। কিন্তু খুব শীঘ্রই ঐ বাহিনীর ভাবমূর্তি নষ্ট হতে থাকে। এর কারণ রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, গুম, গোলাগুলি, এবং ধর্ষণের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে। তাদের যথেচ্ছাচার নিয়ন্ত্রণ বা তাদের কার্যকলাপের জবাবদিহিতার আইনগত কোন ব্যবস্থা ছিল না। অপরাধ স্বীকার করানোর জন্য গ্রেফতারকৃত লোকদের প্রতি অত্যাচার, লুটপাট এবং ভয়-ভীতি দেখিয়ে টাকা আদায়ের অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয়। রক্ষীবাহিনীর সদস্যদেরকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ন্যায় জলপাই রঙের পোশাক এবং বাহিনী গঠন ও প্রশিক্ষণে ভারতের সহায়তা জনমনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে।

গণঅসন্তোষ সত্ত্বেও মুজিব সরকার ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর "জাতীয় রক্ষীবাহিনী (সংশোধনী) অধ্যাদেশ-১৯৭৩" জারি করে রক্ষীবাহিনীর সকল কার্যকলাপ আইনসঙ্গত বলে ঘোষণা করেন। এতে জনগণের মধ্যে মুজিব সরকারের প্রতি সুপ্ত ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে থাকে। সেইসাথে রক্ষীবাহিনীর বিভিন্ন অনাচারের কারণে জনগণের কাছে শেখ মুজিবুর রহমান সরকারের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। রক্ষীবাহিনীকে বেশি সুযোগ-সুবিধা দেয়া এবং সেনাবাহিনীর প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করানোর অভিযোগে সেনাবাহিনীর একাংশের মধ্যেও সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়।

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা

স্বাধীনতার পর অচিরেই মুজিবের সরকারকে ক্রমশ বাড়তে থাকা অসন্তোষ সামাল দিতে হয়। তার রাষ্ট্রীয়করণ ও শ্রমভিত্তিক সমাজতন্ত্রের নীতি প্রশিক্ষিত জনবল, অদক্ষতা, মাত্রাতিরিক্ত দুর্নীতি আর দুর্বল নেতৃত্বের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুজিব অতিমাত্রায় জাতীয় নীতিতে মনোনিবেশ করায় স্থানীয় সরকার প্রয়োজনীয় গুরুত্ব লাভে ব্যর্থ হয়। আওয়ামী লীগ ও কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ করায় গণতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ে। এ সময় তৃণমূল পর্যায়ে কোন নির্বাচনই অনুষ্ঠিত হয়নি। আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের মধ্যে কমিউনিস্ট এবং ইসলামপন্থীরা অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাংলাদেশকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঘোষণা করায় ইসলামপন্থীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। এ ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ পদে আপনজনদের নিয়োগ দেয়ার জন্য মুজিবের বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ আনা হয়।

১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ খাদ্য সংকট আরও বাড়িয়ে দেয় এবং অর্থনীতির প্রধান উৎস কৃষিকে ধ্বংস করে ফেলে। রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাব, দ্রব্যমূল্যের অসামঞ্জস্যতা, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যর্থতার কারণে মুজিবকে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে সংঘাতের মাত্রা বাড়তে থাকায় মুজিবও তার ক্ষমতা বাড়াতে থাকেন। ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মুজিব জরুরি অবস্থা জারি করেন। এই সংকটের চূড়ান্ত সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি শেখ মুজিব নতুন যে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনে উদ্যোগী হন, একে তিনি বাংলাদেশের দ্বিতীয় বিপ্লব বলে আখ্যা দেন।

দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচির মধ্যে দুটি দিক ছিল-সরকার ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক কর্মসূচি এবং আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি। ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় পদ্ধতির স্থলে রাষ্ট্রপতিশাসিত ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এ সরকারে শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি এবং ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলীকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়। পরিবর্তিত সংবিধানের আওতায় ৬ই জুন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল দল, সরকারি-বেসরকারি এবং অন্যান্য সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সদস্য নির্বিশেষে সকল শ্রেণি-পেশার ব্যক্তিবিশেষকে অন্তর্ভুক্ত করে 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' নামে একটি জাতীয় দল গঠন করা হয়। এ সময় শেখ মুজিব নিজেকে আমৃত্যু রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেন। বাকশাল প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনসাধারণ, কৃষক ও শ্রমিকদের প্রতিনিধি হিসেবে নিজেদের বিবেচিত করে এককভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রের কর্তৃত্ব গ্রহণ করতে থাকে। বাকশাল বিরোধী সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। সরকারপন্থী চারটি সংবাদপত্র বাদে সকল সংবাদপত্র নিষিদ্ধ করা হয়। শেখ মুজিব জাতীয় রক্ষীবাহিনীর সহায়তায় বাকশাল-বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতার করেন এবং সারাদেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর কড়া নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেন। অনেকের মতে, তার এই নীতির ফলে অস্থিতিশীল অবস্থা আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং দুর্নীতি, কালোবাজারী ও অবৈধ মজুদদারি অনেকাংশে বন্ধ হয়ে যায়। তবে রক্ষীবাহিনী এবং পুলিশের বিরুদ্ধে অত্যাচার ও রাজনৈতিক হত্যার অভিযোগ ওঠা সত্ত্বেও মুজিব নীরব ভূমিকা পালন করেন। ফলে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারীরা মুজিবের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠেন এবং তার কর্মকাণ্ডকে গণতন্ত্র ও নাগরিক অধিকার বিরোধী বলে গণ্য করেন। মুজিব ও বাকশাল বিরোধীরা গণঅসন্তোষ এবং সরকারের ব্যর্থতার কারণে মুজিব-সরকারের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে ওঠে।

হত্যাকাণ্ড

১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট প্রত্যূষে একদল সেনা কর্মকর্তা ট্যাঙ্ক দিয়ে রাষ্ট্রপতির ধানমন্ডিস্থ বাসভবন ঘিরে ফেলে এবং শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবার এবং ব্যক্তিগত কর্মচারীদের হত্যা করে। শেখ মুজিবের পরিবারের সদস্য-বেগম ফজিলাতুন্নেসা, শেখ কামাল ও তার স্ত্রী সুলতানা কামাল খুকী, শেখ জামাল ও তার স্ত্রী পারভীন জামাল রোজী, শেখ রাসেল, শেখ মুজিবের ভাই শেখ আবু নাসের হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। এই দিন শেখ মুজিবুর রহমানের ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মনি এবং তার স্ত্রী বেগম আরজু মনি, শেখ মুজিবের ভগ্নিপতি ও মন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাত, তার কন্যা বেবী সেরনিয়াবাত, পুত্র আরিফ সেরনিয়াবাত, নাতনি সুকান্ত বাবু, বড় ভাইয়ের ছেলে সজীব সেরনিয়াবাত ও এক আত্মীয় বেন্টু খানকে হত্যা করা হয়। এছাড়া শেখ মুজিবের প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা জামিল উদ্দিন আহমেদ, এসবি কর্মকর্তা সিদ্দিকুর রহমান ও সেনা সদস্য সৈয়দ মাহবুবুল হক নিহত হন। কেবলমাত্র তার দুই মেয়ে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা তৎকালীন পশ্চিম জার্মানিতে অবস্থান করায় প্রাণে বেঁচে যান। তাদের বাংলাদেশে ফিরে আসার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

শেখ মুজিবের শরীরে মোট ১৮টি বুলেটের দাগ দেখতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে, একটি বুলেটে তার ডান হাতের তর্জনী বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। শেখ মুজিব ও তার পরিবারের মরদেহ দাফনের ব্যবস্থা করতে সেনা সদর থেকে ঢাকা সেনানিবাসের তৎকালীন স্টেশন কমান্ডার লে. কর্নেল এম এ হামিদকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি গিয়ে আবিষ্কার করেন নির্দিষ্ট কফিনে শেখ মুজিবের মরদেহ মনে করে তার ভাই শেখ নাসেরের মরদেহ রাখা হয়েছে। দায়িত্বরত সুবেদার এর ব্যাখ্যা দেন যে, দুই ভাই দেখতে অনেকটা একরকম হওয়ায় ও রাতের অন্ধকারের কারণে মরদেহ অদল-বদল হয়ে গিয়েছিল। পরের দিন ১৬ আগস্ট শেখ মুজিবের মরদেহ জন্মস্থান টুঙ্গিপাড়ায় হেলিকপ্টারে করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সামরিক তত্ত্বাবধানে দাফন করা হয়। অন্যান্যদেরকে ঢাকার বনানী কবরস্থানে দাফন করা হয়।

প্রতিক্রিয়া ও বিচার

সেনা অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেন বিক্ষুব্ধ আওয়ামী লীগের সদস্য এবং সামরিক কর্মকর্তারা। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শেখ মুজিবের প্রাক্তন সহকর্মী খন্দকার মোশতাক আহমেদ, যিনি পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপতির পদে স্থলাভিষিক্ত হন।

১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর মুজিব হত্যাকাণ্ডের বিচারের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে খন্দকার মোশতাক সরকার ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ (দায়মুক্তির অধ্যাদেশ) জারি করেন এবং জেনারেল জিয়াউর রহমান ও পাকিস্তানপন্থী প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমানের নেতৃত্বে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীতে তার বৈধতা দেয়া হয়, যা ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই আগস্ট তারিখে জাতীয় সংসদে রহিত করা হয়। সংবাদমাধ্যমে এ হত্যাকাণ্ডের ইন্ধনদাতা হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি (সিআইএ)-কে দায়ী করা হয়। লরেন্স লিফশুলজ বাংলাদেশে নিযুক্ত তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ইউজিন বুস্টারের সূত্রে সিআইএ-কে সামরিক অভ্যুত্থান ও গণহত্যার জন্য দোষারোপ করেন। মুজিবের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে বহু বছরের জন্য চলমান রাজনৈতিক সংঘাতের সূচনা ঘটে। সেনা অভ্যুত্থানের নেতারা অল্পদিনের মধ্যে উচ্ছেদ হয়ে যান এবং অভ্যুত্থান, পাল্টা অভ্যুত্থান আর রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডে দেশে চলমান অচলাবস্থা তৈরি হয় ও সেনাবাহিনীতে ব্যাপক অরাজকতা দেখা দেয়। ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর তৃতীয় সেনা অভ্যুত্থানের ফলে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতা আসীন হয়। তিনি ইনডেমনিটি অধ্যাদেশকে সমর্থন করে মুজিব হত্যার বিচার স্থগিত করে দেন এবং মুজিবপন্থী সেনাসদস্যদের গ্রেফতার করেন। সেনা অভ্যুত্থানের অন্যতম প্রধান নেতা কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমানসহ ১৪ জন সেনা কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করা হয়। বাকিরা বিদেশে পালিয়ে গিয়েছিলেন। ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত সহকারী আ ফ ম মহিতুল ইসলাম বাদী হয়ে ধানমন্ডি থানায় মুজিব হত্যাকাণ্ডের মামলা দায়ের করেন এবং ১২ই নভেম্বর জাতীয় সংসদে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করা হয়।

১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে বিচারক কাজী গোলাম রসুল শেখ মুজিব হত্যার বিচারের এজলাস গঠন করেন। ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ১৫ জন আসামিকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়। ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে রায়ের বিরুদ্ধে কৃত আপিলে হাইকোর্টের দুইটি বেঞ্চ ভিন্ন ভিন্ন রায় দেয়। ফলে ২০০২ খ্রিষ্টাব্দে মামলাটি তৃতীয় বেঞ্চে পাঠানো হয় এবং সেখানে ১২ জনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল থাকে। ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দে এ বিচারের চূড়ান্ত রায় ঘোষিত হয়। ২০১০ খ্রিষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারি সৈয়দ ফারুক রহমানসহ ৫ জন আসামিকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়। ২০২০ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল অন্যতম আসামি আব্দুল মাজেদকে ভারত থেকে বাংলাদেশে এনে গ্রেফতার করা হয় এবং ১২ই এপ্রিল তার মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর করা হয়।

ব্যক্তিগত জীবন ও পরিবার

মুজিব ও তার স্ত্রী বেগম ফজিলাতুন্নেছা

১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে দাদা আব্দুল হামিদের আদেশে শেখ মুজিবের বাবা ১৪ বছর বয়সী শেখ মুজিবকে তার ৩ বছর বয়সী সদ্য পিতৃ-মাতৃহীন জ্ঞাতি বোন বেগম ফজিলাতুন্নেসার সাথে বিয়ে দেন। বেগম ফজিলাতুন্নেছার বাবা শেখ জহিরুল হক ছিলেন মুজিবুর রহমানের দুঃসম্পর্কের চাচা। উল্লেখ্য, তার বাবা শেখ লুৎফুর রহমান ও মা শেখ সায়েরা খাতুন আপন চাচাতো ভাইবোন ছিলেন। বিয়ের ৯ বছর পর ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে শেখ মুজিব ২২ বছর বয়সে ও ফজিলাতুন্নেসা ১২ বছর বয়সে দাম্পত্যজীবন শুরু করেন। এই দম্পতির ঘরে দুই কন্যা এবং তিন পুত্রের জন্ম হয়- শেখ হাসিনা, শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রেহানা এবং শেখ রাসেল।

১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দের পহেলা অক্টোবর থেকে শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর বাড়িতে বসবাস করতে থাকেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর পর্যন্ত শেখ পরিবারকে এই বাড়িতেই গৃহবন্দি করে রাখে। শেখ কামাল ও জামাল পাহারারত সেনাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে নিরাপদ স্থানে চলে যান এবং মুক্তি সংগ্রামে যোগ দেন। শেখ কামাল ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে মুক্তিবাহিনীর গেরিলা যুদ্ধের একজন সমন্বয়ক ছিলেন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর যুদ্ধকালীন কমিশন লাভ করেন। তিনি মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি মুহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানীর এডিসি ছিলেন। তাকে শেখ মুজিবের শাসনামলে তার উত্তরাধিকারী হিসেবে বিবেচনা করা হতো। শেখ জামাল যুক্তরাজ্যের রয়েল মিলিটারি একাডেমি স্যান্ডহার্স্টে প্রশিক্ষণ নেন এবং এরপর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কমিশন্ড অফিসার পদে যোগ দেন।

শেখ মুজিবের প্রায় পুরো পরিবারই ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট রাতে সেনা অভিযানে নিহত হন। কেবলমাত্র দুই কন্যা-শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা ঐসময় তৎকালীন পশ্চিম জার্মানিতে অবস্থানের কারণে বেঁচে যান। শেখ হাসিনা দেশে প্রত্যাবর্তন করে পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের হাল ধরেন। তিনি বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চতুর্থ মেয়াদে এবং ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী হিসেবেও তিন মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেছেন।

শেখ রেহানার কন্যা বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ লেবার পার্টির রাজনীতিবিদ টিউলিপ সিদ্দিক ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে যুক্তরাজ্যের হাউজ অব কমন্সের সদস্য (গ্রেটার লন্ডনের হ্যাম্পস্টেড অ্যান্ড কিলবার্ন আসন থেকে নির্বাচিত)। শেখ মুজিবের ভগ্নিপতি আবদুর রব সেরনিয়াবাত শ্রমিকনেতা ও তার মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মনি ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে মুজিব বাহিনীর প্রধান নেতা ছিলেন ও ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে যুবলীগ প্রতিষ্ঠা করেন (উভয়েই ১৫ আগস্ট নিহত হন)। বর্তমানে শেখ মুজিবের ভাগ্নে শেখ ফজলুল করিম সেলিম, আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং ভ্রাতুষ্পুত্র শেখ হেলাল উদ্দীন ও শেখ সালাহউদ্দিন জুয়েল বাংলাদেশের সাংসদ। শেখ ফজলে নূর তাপস, মজিবুর রহমান চৌধুরী, নূর-ই-আলম চৌধুরী, আন্দালিব রহমান, শেখ সারহান নাসের তন্ময়, সেরনিয়াবাত সাদিক আবদুল্লাহ, শেখ ফজলে শামস পরশ, এবং শেখ ফজলে ফাহিম-বাংলাদেশের প্রথম সারির রাজনীতিবিদ ও সম্পর্কে তার নাতি হন।

তথ্য সংগ্রহে : মাসুদুল করিম অরিয়ন।

১৫ আগষ্টের ঘটনা প্রবাহ

১৫ আগস্ট জাতীয় শোকের দিন। বাংলার আকাশ-বাতাস আর প্রকৃতিও অশ্রুসিক্ত হওয়ার দিন। কেননা পঁচাত্তরের এই দিনে আগস্ট আর শ্রাবণ মিলেমিশে একাকার হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর রক্ত আর আকাশের মর্মছেঁড়া অশ্রুর প্লাবনে। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট সুবেহ সাদিকের সময় যখন ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে নিজ বাসভবনে সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে বুলেটের বৃষ্টিতে ঘাতকরা ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল, তখন যে বৃষ্টি ঝরছিল, তা যেন ছিল প্রকৃতিরই অশ্রুপাত। ভেজা বাতাস কেঁদেছে সমগ্র বাংলায়। ঘাতকদের উদ্যত অস্ত্রের সামনে ভীতসন্ত্রস্ত বাংলাদেশ বিহ্বল হয়ে পড়েছিল শোকে আর অভাবিত ঘটনার আকস্মিকতায়। কাল থেকে কালান্তরে জ্বলবে এ শোকের আগুন।

সেই কালো রাতে শহীদ হয়েছিলেন যারা

১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্টের কালরাতে ঘাতকের হাতে নিহত হন বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী শেখ ফজিলাতুননেছা, পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রাসেল, শেখ কামালের স্ত্রী সুলতানা কামাল, জামালের স্ত্রী রোজী জামাল, বঙ্গবন্ধুর ভাই শেখ নাসের, এসবি অফিসার সিদ্দিকুর রহমান, কর্ণেল জামিল, সেনা সদস্য সৈয়দ মাহবুবুল হক, প্রায় একই সময়ে ঘাতকরা বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে যুবলীগ নেতা শেখ ফজলুল হক মণির বাসায় হামলা চালিয়ে শেখ ফজলুল হক মণি, তাঁর অন্তঃসত্তা স্ত্রী আরজু মণি, বঙ্গবন্ধুর ভগ্নিপতি আবদুর রব সেরনিয়াতের বাসায় হামলা করে সেরনিয়াবাত ও তার কন্যা বেবী, পুত্র আরিফ সেরনিয়াবাত, নাতি সুকান্ত বাবু, আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বড় ভাইয়ের ছেলে সজীব সেরনিয়াবাত এবং এক আত্মীয় বেন্টু খান।

সেই কালো রাতে যা ঘটেছিল

বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত সহকারী (রেসিডেন্ট পি এ) জনাব আ ফ ম মোহিতুল ইসলাম এর এজাহারে বর্ণনানুসারে :

১৯৭৫ সালে তিনি তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের ৬৭৭ নম্বর বাড়িতে কর্মরত ছিলেন। ১৪ আগষ্ট (১৯৭৫) রাত আটটা থেকে ১৫ আগষ্ট সকাল আটটা পর্যন্ত তিনি ডিউটিতে ছিলেন ওই বাড়িতে। ১৪ আগষ্ট রাত বারোটার পর ১৫ আগষ্ট রাত একটায় তিনি তাঁর নির্ধারিত বিছানায় শুতে যান। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম তা খেয়াল নেই। হঠাৎ টেলিফোন মিস্ত্রি আমাকে উঠিয়ে (জাগিয়ে তুলে) বলেন, প্রেসিডেন্ট সাহেব আপনাকে ডাকছেন। তখন সময় ভোর সাড়ে চারটা কী পাঁচটা। চারদিকে আকাশ ফর্সা হয়ে গেছে। বঙ্গবন্ধু ফোনে আমাকে বললেন, সেরনিয়াতের বাসায় দুষ্কৃতকারী আক্রমণ করেছে। আমি জলদি পুলিশ কন্ট্রোল রুমে ফোন করলাম। অনেক চেষ্টার পরও পুলিশ কন্ট্রোল রুমে লাইন পাচ্ছিলাম না। তারপর গণভবন এক্সচেঞ্জে লাইন লাগানোর চেষ্টা করলাম। এরপর বঙ্গবন্ধু ওপর থেকে নিচে নেমে এসে আমার কাছে জানতে চান পুলিশ কন্ট্রোল রুম থেকে কেন কেউ ফোন ধরছে না। এসময় আমি ফোন ধরে হ্যালো হ্যালো বলে চিৎকার করছিলাম। তখন বঙ্গবন্ধু আমার হাত থেকে রিসিভার নিয়ে বললেন আমি প্রেসিডেন্ট বলছি। এসময় দক্ষিণ দিকের জানালা দিয়ে একঝাঁক গুলি এসে ওই কক্ষের দেয়ালে লাগল।

তখন অন্য ফোনে চিফ সিকিউরিটি মহিউদ্দিন কথা বলার চেষ্টা করছিলেন। গুলির তান্ডবে কাঁচের আঘাতে আমার ডান হাত দিয়ে রক্ত ঝরতে থাকে। এসময় জানালা দিয়ে অনর্গল গুলি আসা শুরু হলে বঙ্গবন্ধু শুয়ে পড়েন। আমিও শুয়ে পড়ি। কিছুক্ষণ পর সাময়িকভাবে গুলিবর্ষণ বন্ধ হলে বঙ্গবন্ধু উঠে দাঁড়ালেন। আমিও উঠে দাঁড়ালাম। ওপর থেকে কাজের ছেলে সেলিম ওরফে আবদুল বঙ্গবন্ধুর পাঞ্জাবী ও চশমা নিয়ে এলো। পাঞ্জাবী ও চশমা পরে বঙ্গবন্ধু বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। তিনি (বঙ্গবন্ধু) বললেন আর্মি সেন্ট্রি, পুলিশ সেন্ট্রি এত গুলি চলছে তোমরা কি কর? এসময় শেখ কামাল বলল আর্মি ও পুলিশ ভাই আপনারা আমার সঙ্গে আসুন। কালো পোশাক পরা একদল লোক এসে শেখ কামালের সামনে দাঁড়ালো। আমি (মোহিতুল) ও ডিএসপি নূরুল ইসলাম খান শেখ কামালের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। নরুল ইসলাম পেছন দিক থেকে টান দিয়ে আমাকে তার অফিস কক্ষে নিয়ে গেল। আমি ওখান থেকে উঁকি দিয়ে বাইরে দেখতে চেষ্টা করলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে আমি গুলির শব্দ শুনলাম। এসময় শেখ কামাল গুলি খেয়ে আমার পায়ের কাছে এসে পড়লেন। কামাল ভাই চিৎকার করে বললেন, আমি শেখ মুজিবের ছেলে শেখ কামাল, ভাই ওদেরকে বলেন। আক্রমণকারীদের মধ্যে কালো পোশাকধারী ও খাকি পোশাকধারী ছিল। এসময় আবার আমরা গুলির শব্দ শোনার পর দেখি ডিএসপি নূরুল ইসলাম খানের পায়ে গুলি লেগেছে। তখন আমি বুঝতে পারলাম আক্রমণকারীরা আর্মির লোক। হত্যাকান্ডের জন্যই তারা এসেছে। নূরুল ইসলাম যখন আমাদেরকে রুম থেকে বের করে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিলেন তখন মেজর বজলুল হুদা এসে আমার চুল টেনে ধরলো। বজলুল হুদা আমাদেরকে নিচে নিয়ে গিয়ে লাইনে দাঁড় করালো। কিছুক্ষণ পর নিচে থেকে আমরা বঙ্গবন্ধুর উচ্চকণ্ঠ শুনলাম। বিকট শব্দে গুলি চলার শব্দ শুনতে পেলাম আমরা। শুনতে পেলাম মেয়েদের আত্মচিৎকার, আহাজারি। এরইমধ্যে শেখ রাসেল ও কাজের মেয়ে রুমাকে নিচে নিয়ে আসা হয়। রাসেল আমাকে জড়িয়ে ধরে বলে, আমাকে মারবেনাতো। আমি বললাম না তোমাকে কিছু বলবে না। আমার ধারণা ছিল অতটুকু বাচ্চাকে তারা কিছু বলবে না। কিছুক্ষণ পর রাসেলকে তার মায়ের কাছে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে রুমের মধ্যে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। সেদিন রাসেলের আর্তচিৎকারে খোদার আরশ কেঁপে উঠলেও টলাতে পারেনি খুনী পাষাণদের মন। বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যের মত এই নিষ্পাপ শিশুকেও পঁচাত্তরের পনেরই আগস্ট ঠান্ডা মাথায় খুন করা হয়েছিল। ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে

ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ' গ্রন্থে রাসেলকে হত্যার এই নৃশংস বর্ণনা দিয়েছেন। এম এ ওয়াজেদ মিয়া তার গ্রন্থে লেখেন বঙ্গবন্ধুসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে হত্যার পর রাসেল দৌড়ে নিচে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো বাড়ির কাজের লোকজনের কাছে আশ্রয় নেয়। রাসেলের দীর্ঘকাল দেখাশুনার দায়িত্বে থাকা আবদুর রহমান রমা তখন রাসেলের হাত ধরে রেখেছিলেন। একটু পরেই একজন সৈন্য রাসেলকে বাড়ির বাইরে পাঠানোর কথা বলে রমার কাছ থেকে তাকে নিয়ে নেয়। রাসেল তখন ডুকরে কাঁদতে কাঁদতে তাকে না মারার জন্য আল্লাহ'র দোহাই দেয়। রাসেলের এই মর্মস্পর্শী আর্তিতে একজন সৈন্যের মন গলায় সে তাকে বাড়ির গেটে সেন্ট্রিবক্সে লুকিয়ে রাখে। কিন্তু এর প্রায় আধ ঘন্টা পর একজন মেজর সেখানে রাসেলকে দেখতে পেয়ে তাকে দোতলায় নিয়ে ঠান্ডা মাথায় রিভলবারের গুলিতে হত্যা করে। ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র দুরন্তপ্রাণ শেখ রাসেল এমন সময়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন যখন তার পিতার রাজনৈতিক জীবনকে দেখতে শুরু করেছিলেন মাত্র। এরপর মেজর বজলুল হুদা বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের গেটে দাঁড়িয়ে থাকা মেজর ফারুককে বলে অল আর ফিনিশড।

অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেল ফারুক রহমানের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে তিনি বলেন, খোন্দকার মোশতাকের নির্দেশে তিনি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট তিনি বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে অভিযান পরিচালনা করেন। ওই বাসভবনে অভিযানের সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন তিনি। অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেল রশিদ দায়িত্ব পালন করেছেন বঙ্গভবনে, অবসরপ্রাপ্ত মেজর ডালিম ছিলেন বেতার কেন্দ্রে। গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে সামরিক কর্মকর্তাদের দায়িত্ব বন্টন করেছেন তিনি (ফারুক) নিজেই।

মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত অপশক্তির ষড়যন্ত্র থেমে থাকেনি। পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে তারা একের পর এক চক্রান্তের ফাঁদ পেতেছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সেনাবাহিনীর বিপথগামী উচ্চাভিলাষী কয়েকজন সদস্যকে ষড়যন্ত্রকারীরা ব্যবহার করেছে ওই চক্রান্তেরই বাস্তব রূপ দিতে। এরাই স্বাধীনতার সূতিকাগার বলে পরিচিত ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাড়িটিতে হামলা চালায় গভীর রাতে। হত্যা করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারকে। বিশ্ব ও মানবসভ্যতার ইতিহাসে ঘৃণ্য ও নৃশংসতম এই হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে সেদিন তারা কেবল বঙ্গবন্ধুকেই নয়, তার সঙ্গে বাঙালির হাজার বছরের প্রত্যাশার অর্জন স্বাধীনতার আদর্শগুলোকেও হত্যা করতে চেয়েছিল। মুছে ফেলতে অপপ্রয়াস

চালিয়েছিল বাঙালির বীরত্বগাথার ইতিহাসও। বঙ্গবন্ধুর নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড বাঙালি জাতির জন্য করুণ বিয়োগগাথা হলেও ভয়ঙ্কর ওই হত্যাকাণ্ডে খুনিদের শাস্তি নিশ্চিত না করে বরং দীর্ঘ সময় ধরে তাদের আড়াল করার অপচেষ্টা হয়েছে। এমনকি খুনিরা পুরস্কৃতও হয়েছে নানাভাবে। হত্যার বিচার ঠেকাতে কুখ্যাত 'ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ' জারি করেছিল বঙ্গবন্ধুর খুনি খন্দকার মোশতাক সরকার।

১৯৭৬ সালের ৮ জুন ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকার দায়ে অভিযুক্ত হত্যাকারী গোষ্ঠীর ১২ জনকে বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দেওয়া হয়েছিল

১. লে. কর্নেল শরিফুল হককে (ডালিম) চীনে প্রথম সচিব,
২. লে. কর্নেল আজিজ পাশাকে আর্জেন্টিনায় প্রথম সচিব,
৩. মেজর এ কে এম মহিউদ্দিন আহমেদকে আলজেরিয়ায় প্রথম সচিব,
৪. মেজর বজলুল হুদাকে পাকিস্তানে দ্বিতীয় সচিব,
৫. মেজর শাহরিয়ার রশিদকে ইন্দোনেশিয়ায় দ্বিতীয় সচিব,
৬. মেজর রাশেদ চৌধুরীকে সৌদি আরবে দ্বিতীয় সচিব,
৭. মেজর নূর চৌধুরীকে ইরানে দ্বিতীয় সচিব,
৮. মেজর শরিফুল হোসেনকে কুয়েতে দ্বিতীয় সচিব,
৯. কর্নেল কিসমত হাশেমকে আবুধাবিতে তৃতীয় সচিব,
১০. লে. খায়রুজ্জামানকে মিসরে তৃতীয় সচিব,
১১. লে. নাজমুল হোসেনকে কানাডায় তৃতীয় সচিব,
১২. লে. আবদুল মাজেদকে সেনেগালে তৃতীয় সচিব হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।

ইনডেমনিটি (দায়মুক্তি) অধ্যাদেশ

বাংলাদেশের ইতিহাসের আরেক কালো অধ্যায়

খুনিদের বাঁচানোর জন্য ১৯৭৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর স্ব-ঘোষিত রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমেদ (যিনি বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রীসভার বানিজ্য মন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন) ইনডেমনিটি (দায়মুক্তি) অধ্যাদেশ জারি করেন। সেদিন ছিল শুক্রবার। 'দি বাংলাদেশ গেজেট, পাবলিশড বাই অথরিটি' লেখা অধ্যাদেশটিতে খন্দকার মোশতাকের স্বাক্ষর আছে। মোশতাকের স্বাক্ষরের পর আধ্যাদেশে তত্কালীন আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব এম এইচ রহমানের স্বাক্ষর আছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে

নিহত হওয়ার পর মোশতাক নিজেকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা দেন। অধ্যাদেশটিতে দুটি ভাগ আছে। প্রথম অংশে বলা হয়েছে, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোরে বলবত্ আইনের পরিপন্থী যা কিছুই ঘটুক না কেন, এ ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টসহ কোনো আদালতে মামলা, অভিযোগ দায়ের বা কোনো আইনি প্রক্রিয়ায় যাওয়া যাবে না। দ্বিতীয় অংশে বলা আছে, রাষ্ট্রপতি উল্লিখিত ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে যাদের প্রত্যয়ন করবেন তাদের দায়মুক্তি দেওয়া হলো। অর্থাৎ তাদের বিরুদ্ধে কোনো আদালতে মামলা, অভিযোগ দায়ের বা কোনো আইনি প্রক্রিয়ায় যাওয়া যাবে না। এরপর ক্ষমতায় আসে আর এক সামরিক শাসক মেজর জিয়া। তিনি ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি সামরিক আইনের অধীনে দেশে দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশ আসন পেয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। এরপর তিনি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ সহ চার বছরে সামরিক আইনের আওতায় সব অধ্যাদেশ, ঘোষণাকে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে আইনি বৈধতা দেন। ইনডেমনিটি অধ্যাদেশে যা বলা হয়েছিল, "১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল তারিখের (উভয় দিনসহ) মধ্যে প্রণীত সকল ফরমান, ফরমান আদেশ, সামরিক আইন প্রবিধান, সামরিক আইন আদেশ, ও অন্যান্য আইন, এবং উক্ত মেয়াদের মধ্যে অনুরূপ কোনো ফরমান দ্বারা এই সংবিধানের যে সকল সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন ও বিলোপসাধন করা হইয়াছে তাহা, এবং অনুরূপ কোনো ফরমান, সামরিক আইন প্রবিধান, সামরিক আইন আদেশ বা অন্য কোনো আইন হইতে আহরিত বা আহরিত বলিয়া বিবেচিত ক্ষমতাবলে, অথবা অনুরূপ কোনো ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে গিয়া বা অনুরূপ বিবেচনায় কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত কোনো আদেশ কিংবা প্রদত্ত কোনো দণ্ডাদেশ কার্যকর বা পালন করিবার জন্য উক্ত মেয়াদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত আদেশ, কৃত কাজকর্ম, গৃহীত ব্যবস্থা বা কার্যধারাসমূহ, অথবা প্রণীত, কৃত, বা গৃহীত বলিয়া বিবেচিত আদেশ, কাজকর্ম, ব্যবস্থা বা কার্যধারাসমূহ এতদ্বারা অনুমোদিত ও সমর্থিত হইল এবং ঐ সকল আদেশ, কাজকর্ম, ব্যবস্থা বা কার্যধারাসমূহ বৈধভাবে প্রণীত, কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হইল, এবং তৎসম্পর্কে কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের নিকট কোনো কারণেই কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না। পঁচাত্তরের পনেরই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্য এবং ৩ নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে জাতীয় চার নেতাকে নৃশংসভাবে হত্যার লোক দেখানো তদন্ত

কমিটি গঠন করেন খন্দকার মোশতাক। পরবর্তীতে জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে এ দেশের ইতিহাসে বর্বরতম হত্যার তদন্ত কার্যক্রম স্থগিত করে দেন এবং খুনীদের দেশ থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করার পাশাপাশি কূটনৈতিক দায়িত্ব প্রদান করেন, যা লন্ডনে গঠিত তদন্ত কমিশনের রিপোর্টেও বলা হয়েছে। এসব হত্যার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইন ও বিচারের প্রক্রিয়াকে যে সমস্ত কারণ বাধাগ্রস্ত করেছে সেগুলোর তদন্ত করার জন্য ১৯৮০ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে এই তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়। তবে সেই সময়ে বাংলাদেশ সরকারের অসহযোগিতার কারণে এবং কমিশনের একজন সদস্যকে ভিসা প্রদান না করায় এ উদ্যোগটি সফল হতে পারেনি সেজন্য সে সময়ে বাংলাদেশের সরকার প্রধান জিয়াউর রহমান কেই দায়ী করা হয়।

তথ্য সংগ্রহে : মাসুদুল করিম অরিয়ন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা

আলহাজ্ব আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক এম.পি.

মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ঐতিহাসিক ১৯ মার্চ। ১৯৭১ সালের এই দিনে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে গাজীপুরের (সেই সময়ের জয়দেবপুর) জনগণ সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। মনে পড়ে মার্চের সেই এক অবিস্মরণীয় গণ-অভ্যুত্থানের কথা। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ দুপুরে হঠাৎ এক বেতার ভাষণে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেন। এ কথা শোনামাত্রই সারা দেশের মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। দেশের সর্বত্রই স্লোগান ওঠে 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো', 'পিন্ডি না ঢাকা, ঢাকা-ঢাকা', 'পাঞ্জাব না বাংলা, বাংলা-বাংলা', 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা', 'তুমি কে আমি কে, বাঙালি-বাঙালি'। বঙ্গবন্ধু ঢাকায় পূর্বাণী হোটেলে এক সভায় ইয়াহিয়ার ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং ঢাকায় ২ মার্চ ও সারা বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) ৩ মার্চ হরতাল আহ্বান করেন এবং ৭ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জনসভা আহ্বান করেন। জয়দেবপুরে আমার পরামর্শে ২ মার্চ রাতে তৎকালীন থানা পশুপালন কর্মকর্তা আহম্মেদ ফজলুর রহমানের সরকারি বাসায় মহকুমা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. হাবিব উল্লাহ সর্বদলীয় সভা আহ্বান করেন। সভায় আমাকে (আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক) আহ্বায়ক করে এবং মেশিন টুলস ফ্যাক্টরির শ্রমিকনেতা নজরুল ইসলাম খানকে কোষাধ্যক্ষ করে ১১ সদস্যবিশিষ্ট এক সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। সদস্য হন অধ্যাপক আয়েশ উদ্দিন, মো. নুরুল ইসলাম (ভাওয়ালরত্ন), মো. আবদুস ছাত্তার মিয়া (চৌরাস্তা), থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মরহুম হজরত আলী মাস্টার (চৌরাস্তা), মো. শহীদ উল্লাহ বাচ্চু (মরহুম), হারুন-অর-

রশিদ ভূঁইয়া (মরহুম), শহিদুল ইসলাম পাঠান জিন্নাহ (মরহুম), শেখ আবুল হোসেন (শ্রমিক লীগ), থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি সাঈদ বকস ভূঁইয়া (মরহুম)। কমিটির হাইকমান্ড (উপদেষ্টা) হন মো. হাবিব উল্লাহ (মরহুম), শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা এম এ মুত্তালিব এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ) নেতা বাবু মনীন্দ্রনাথ গোস্বামী (মরহুম)। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার আগেই আমরা এ কমিটি গঠন করেছিলাম। আমি ১৯৬৬ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে 'স্বাধীন বাংলা নিউক্লিয়াস'-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হই। নিউক্লিয়াসের উদ্দেশ্য ছিল সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশকে স্বাধীন করা, যা মূলত বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ১৯৬২ সালেই ছাত্রলীগের মধ্যে গঠিত হয়েছিল। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মধ্যেই সশস্ত্র যুদ্ধ করে বাংলাদেশ স্বাধীন করার জন্য বঙ্গবন্ধুর পরামর্শে বাঙালি সৈন্যদের মধ্যেও নিউক্লিয়াস গঠিত হয়েছিল ১৯৬৪ সালে, যার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাবে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট স্বঘোষিত ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের দায়ের করা 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান' মামলায়। স্বাধীন বাংলা নিউক্লিয়াসের সঙ্গে জড়িত থাকার কারণেই বুঝতে পেরেছিলাম যে সশস্ত্র যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার এটাই মাহেন্দ্রক্ষণ। জয়দেবপুরে (গাজীপুরে) সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ৩ মার্চ গাজীপুর স্টেডিয়ামের পশ্চিম পাশের বটতলায় এক সমাবেশ করে পাকিস্তানের পতাকা পুড়িয়ে দেওয়া হয়। আমরা ৭ মার্চ জয়দেবপুর (গাজীপুর) থেকে হাজার হাজার মানুষ ট্রেনে করে এবং শতাধিক ট্রাক ও বাসে কওে মাথায় লাল ফিতা বেঁধে সোহরাওয়ার্দী (তৎকালীন রেসকোর্স) উদ্যানে জনসভায় যোগ দিলাম। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। আজকে ভাবতেও অবাক লাগে, কীভাবে এ জনস্রোত এসে মিশে গিয়েছিল ৭ মার্চের মহাসমুদ্রে। ৭ মার্চ উজ্জীবিত হয়ে আমরা সম্ভবত ১১ মার্চ গাজীপুর সমরাস্ত্র কারখানা (অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি) আক্রমণ করি। গেটে বাধা দিলে আমি হাজার হাজার মানুষের সামনে টেবিলে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেছি মাইকে। পাকিস্তানিদের বুঝতে পারার জন্য ইংরেজিতে বলি I do hereby dismiss Brigadier Karimullah from the directorship of Pakistan Ordnance Factory and do hereby appoint Administrative officer Mr Abdul Qader (বাঙালি) as the director of the ordnance Factory. এ ঘোষণায় কাজ হয়েছিল। পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ার পেছনের গেট দিয়ে সালনা হয়ে পালিয়ে ঢাকায় চলে আসে। পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ার আর পরবর্তী সময়ে ১৫ এপ্রিলের আগে গাজীপুরে যায়নি। পাকিস্তান সমরাস্ত্র কারখানা ২৭ মার্চ পর্যন্ত আমাদের দখলেই

ছিল। সম্ভবত ১৩ মার্চ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জিওসি সাহেবজাদা ইয়াকুব আলী জয়দেবপুর রাজবাড়ি মাঠে হেলিকপ্টারে অবতরণ করতে চেষ্টা করলে শত শত মানুষ হেলিকপ্টারের প্রতি ইটপাটকেল ও জুতা ছুড়তে শুরু করলে হেলিকপ্টার না নামতে পেরে ফেরত চলে যায়। সেদিন ১৭ মার্চ বুধবার, মহান নেতা বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে মানুষের ঢল নেমেছিল ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে। আমাদের নির্বাচনী এলাকার এমএনএ সামসুল হক (পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভার সদস্য), হাবিব উল্লাহসহ আমি গিয়েছিলাম বঙ্গবন্ধুকে জয়দেবপুরে দ্বিতীয় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টকে নিরস্ত্র করার সংবাদ দিতে। সন্ধ্যায় আমরা পেছনে দাঁড়িয়ে আছি দেখতে পেয়ে কিছু বলতে চাই কি না বঙ্গবন্ধু জানতে চান। কুর্মিটোলা (ঢাকা) ক্যান্টনমেন্টে অস্ত্রের মজুত কমে গেছে অজুহাতে দ্বিতীয় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টে রক্ষিত অস্ত্র আনার জন্য পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সিদ্ধান্ত নেওয়ার সংবাদ জানাই। সামসুল হক সাহেবের ইশারায় আমি তরুণ হিসেবে এ অবস্থায় আমাদের কী করণীয় জানতে চাইলে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'তুই একটা আহম্মক, কী শিখেছিস যে আমাকে বলে দিতে হবে?' একটু পায়চারি করে বললেন, 'বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্র করতে দেওয়া যাবে না। রেসিস্ট এ্যাট দ্য কস্ট অব এনিথিং।' নেতার হুকুম পেয়ে গেলাম। ১৯ মার্চ শুক্রবার আকস্মিকভাবে পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ার জাহান জেবের নেতৃত্বে পাকিস্তানি রেজিমেন্ট জয়দেবপুরের (গাজীপুর) দ্বিতীয় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টকে নিরস্ত্র করার জন্য পৌঁছে যায়। একজন জেসিও (নায়েব সুবেদার) জয়দেবপুর হাইস্কুলের মুসলিম হোস্টেলের পুকুরে (জকি স্মৃতির প্রাইমারি স্কুলের সামনে) গোসল করার সময় জানান যে ঢাকা থেকে ব্রিগেডিয়ার জাহান জেব চলে এসেছে। খবর পেয়ে দ্রুত আমাদের তখনকার আবাসস্থল মুসলিম হোস্টেলে ফিরে গিয়ে উপস্থিত হাবিবউল্লা ও শহীদউল্লাহ বাচ্চুকে এ সংবাদ জানাই। শহীদউল্লাহ বাচ্চু তখনই রিকশায় চড়ে শিমুলতলীতে, মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি, ডিজেল প্ল্যান্ট ও সমরাস্ত্র কারখানায় শ্রমিকদের যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে জয়দেবপুরে চলে আসার খবর দিলে এক ঘণ্টার মধ্যেই হাজার শ্রমিক ও সাধারণ মানুষ চারদিক থেকে লাঠিসোঁটা, দা, কাতরা, ছেন, দোনলা বন্দুকসহ জয়দেবপুরে উপস্থিত হয়। সেদিন জয়দেবপুর হাটের দিন ছিল। জয়দেবপুর রেলগেটে মালগাড়ির বগি, রেলের অকেজো রেললাইন, স্লিপারসহ বড় বড় গাছের গুঁড়ি, কাঠ, বাঁশ, ইট ইত্যাদি যে যেভাবে পেরেছে তা দিয়ে এক বিশাল ব্যারিকেড দেওয়া হয়। জয়দেবপুর থেকে চৌরাস্তা পর্যন্ত আরও পাঁচটি ব্যারিকেড দেওয়া হয়, যাতে পাকিস্তানি বাহিনী অস্ত্র নিয়ে

ফেরত যেতে না পারে। দ্বিতীয় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড ছিলেন মেজর কে এম সফিউল্লাহ (পরবর্তীকালে প্রধান সেনাপতি)। আমরা যখন ব্যারিকেড দিচ্ছিলাম, তখন টাঙ্গাইল থেকে রেশন নিয়ে একটি কনভয় জয়দেবপুরে আসছিল। সে সময় কনভয়ে থাকা পাঁচজন সৈন্যের চায়নিজ রাইফেল তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। এদিকে রেলগেটের ব্যারিকেড সরানোর জন্য দ্বিতীয় ইস্টবেঙ্গলের রেজিমেন্টকে ব্রিগেডিয়ার জাহান জেব আদেশ দেয়। কৌশল হিসেবে বাঙালি সৈন্যদের সামনে দিয়ে পেছনে পাঞ্জাবি সৈন্যদের অবস্থান নিয়ে মেজর সফিউল্লাহকে জনগণের ওপর গুলিবর্ষণের আদেশ দেয়। বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যরা আমাদের (জনতা) ওপর গুলি না কওে আকাশের দিকে গুলি ছুড়ে সামনে আসতে থাকলে আমরা বর্তমান গাজীপুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের ওপর অবস্থান নিয়ে বন্দুক ও চায়নিজ রাইফেল দিয়ে সেনাবাহিনীর ওপর গুলিবর্ষণ শুরু করি। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গুলিতে জয়দেবপুরে শহীদ হন নেয়ামত ও মনু খলিফা, আহত হন ডা. ইউসুফসহ শত শত মানুষ। পাকিস্তানি বাহিনী কারফিউ জারি করে এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ শুরু করলে আমাদের প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে। আমরা পিছু হটলে দীর্ঘ সময় চেষ্টা করে ব্যারিকেড পরিষ্কার করে ব্রিগেডিয়ার জাহান জেব চান্দনা চৌরাস্তায় এসে আবার প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়। নামকরা ফুটবল খেলোয়াড় হুরমত এক পাঞ্জাবি সৈন্যকে পেছন দিয়ে আক্রমণ করেন। সে এক পাঞ্জাবী সৈন্যের রাইফেল কেড়ে নেয়। কিন্তু পেছনে আর এক পাঞ্জাবি সৈন্য হুরমতের মাথায় গুলি করলে হুরমত সেখানেই শাহাদত বরণ করেন।

মাননীয় মুক্তিযোদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আলহাজ্ব এড. আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক ও মরহুম হাবিল উদ্দিন সিকদার জাতীয় সংসদ নির্বাচন - ১৯৯৬ ইং, গোলাম নবী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় , কালিয়াকৈর , গাজীপুর।

বর্তমানে সেই স্থানে চৌরাস্তার মোড়ে 'জাগ্রত চৌরঙ্গী' নামে ভাস্কর্য স্থাপিত হয়েছে। পরদিন বঙ্গবন্ধু আলোচনা চলাকালে পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণে ১৯ মার্চের নিহতের কথা উল্লেখ করলে জেনারেল ইয়াহিয়া খান উল্লেখ করেন যে জয়দেবপুরে জনতা পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর আধুনিক অস্ত্র ও চায়নিজ রাইফেল দিয়ে আক্রমণ করেছে এবং এতে পাকিস্তানি বাহিনীর অনেক সৈন্য আহত হয়েছে।

১৯ মার্চের পর সারা বাংলাদেশে স্লোগান ওঠে, 'জয়দেবপুরের পথ ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো', 'জয়দেবপুরের পথ ধরো, সশস্ত্রযুদ্ধ শুরু করো'। ১৯ মার্চের সশস্ত্রযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এক মাইলফলক। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে ১৯ মার্চ জাতীয় জীবনে এক স্মরণীয় দিন। তাই জাতীয়ভাবে এই দিবসটি পালিত হলে মুক্তিযুদ্ধের মূল্যায়ন যথার্থভাবে হবে বলে আমি মনে করি।

বীর মুক্তিযোদ্ধা

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল প্রকৌশলী
শহীদউল্লাহ চৌধুরী এনডিসি (অবঃ)

আমি ১৯৭১ সালে এসএসসি পরিক্ষার্থী ছিলাম। ১৯৭১ সালের পহেলা মার্চ ঢাকা স্টেডিয়ামে একটা ক্রিকেট খেলা হচ্ছিলো, আমি ও স্টেডিয়ামে বসে ক্রিকেট খেলা দেখছিলাম। হঠাৎ করে শুনলাম যে ইয়াহিয়া খান ঢাকায় যে পার্লামেন্টের একটি সেশন হওয়ার কথা ছিল, সেটা সে প্রোসপন্ড করে দিয়েছে। এখবরে জনতা ও যারা ভিতরে দর্শক ছিল সবাই উত্তেজিত হয়ে খেলাটা পন্ড করে দিল। এবং এরপরে আমরা বেরিয়ে লোকজনের পিছনে পিছনে হোটেল পূর্বাণীতে আসলাম। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্বাণী হোটেলে উনি একটা সাংবাদিক সম্মেলনের ডাক দিলেন। আমরা ওখানে গেলাম। আসলে যে আমি ওই সংবাদ সম্মেলনে গিয়েছিলাম, সেটা ঠিক কোন একটা উদ্দেশ্যে যাইনি। কারণ আমি একটা কিশোর ছিলাম। এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে, তো ওনারা যাচ্ছে আমরাও গেলাম। ওখানে বঙ্গবন্ধু ওনার ভিন্ন আদেশ জারি করলেন, বললেন যে আজ থেকে সারাদেশে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য অবরোধ হবে। স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকবে, অফিস-আদালত বন্ধ থাকবে এবং কোন বাঙালি রেডিও বা টেলিভিশনে পাকিস্তানিদের কোন সংবাদ প্রচার করবে না, এরকম অনেক নির্দেশনা দিলেন। ওখান থেকে আমি চলে আসলাম। তারপরে ঢাকা ইউনিভার্সিটির স্পোর্টস গ্রাউন্ডে আমাদের প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে গেল। ওই প্রশিক্ষণটা যে কি, কেন প্রশিক্ষণটা হচ্ছে বা কি হচ্ছে, সেসব না বুঝেই ওখানে চলে গেলাম। ওখানে গিয়ে আমরা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির ছেলেমেয়েরা প্রথমে পিটি প্যারেড করি, কাঠের রাইফেল

দিয়ে ট্রেনিং নেই। ৭ ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের দিন ঠিক হল এবং ঢাকা শহরে তখন চরম উত্তেজনা, আমরা ভাবলাম যে বঙ্গবন্ধু ঐদিন স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন। এবং আমাদের দৃষ্টিতে স্বাধীনতার ঘোষণা মানেই হলো উনি বলবেন যে আজকে থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ হিসেবে ডিক্লিয়ার করে দিলাম। ওনার বক্তৃতা শুনলাম, ওনার বক্তৃতা শুনে আমি শুধু না অলমোস্ট সবাই আমরা একটু ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে গেলাম। কারণ উনি এমন কিছু বললেন না, উনি যদিও লাস্টে বললেন যে "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম" কিন্তু এর বাইরে আর অন্য কিছু বলেন নাই। বললেন যে, তোমরা যে যার অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হও, এই করো সেই করো কিন্তু আমরা তখন খুব বেশি খুশি হতে পারিনি। যাহোক আজকে আমি বুঝি যে উনি অনেক বিজ্ঞ ও জ্ঞানী লোক ছিলেন। ঐদিন যদি উনি এর বাইরে অন্য কোন কথা বলতেন, তাহলে কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হতো কিনা আমার সন্দেহ আছে। কারণ আপনারা জানেন যে ৭০ দশকে পৃথিবীজুড়ে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রতি একটা নেগেটিভ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। উনি যদি স্বাধীনতার ডিক্লারেশন দিতেন তারমানে ইস্ট পাকিস্তান, পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। তাহলে সারা বিশ্বের যে সাপোর্ট সেটা আমরা পেতাম না। আর দ্বিতীয় কথা হল উনি পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির লিডার। ওনার কাছে ১৬৭ জন এমপি আছে। তো সেই হিসেবে উনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবেন। তাই উনি এটা বলতেই পারেন না। যাই হোক, ঢাকা ইউনিভার্সিটির মাঠে আমাদের প্রশিক্ষণ চলছে। এদিকে পাকিস্তানি অথরিটির সাথে ইয়াহিয়া খান, ভূট্রো ওান্যান্য সবার সাথে বঙ্গবন্ধুর আলোচনা চলছে। তখন আমরা একটা দোলাচলের মধ্যে আছি আসলে কি হবে। যেহেতু যুদ্ধ একটা কঠিন বিষয়। এ ধরনের অভিজ্ঞতা আমাদের কারোরই ছিল না। আমরা অনেকে একটা রঙিন স্বপ্নের মতোন জগতে ছিলাম, মনে হয় যে আমরা এরকম কাঠের রাইফেল দিয়ে ট্রেনিং করতেছি, আর ভাবছি এই পাকিস্তান আর্মির যে মডার্ন ওয়েপন যাদের কাছে আছে তাদের সাথে আমরা মনে হয় এমনি জিতে যাব। এভাবে ২৫ শে মার্চ চলে আসলো। আমাদের বাসা ঢাকার বকশীবাজার, ২৫ তারিখ রাতের ১ টার দিকে আমার বাবা আমাদের ঘুম থেকে উঠালো, আমি আমার ইমিডিয়েট বড় ভাই আমরা দুজন আমাদের বাড়ির একতালায় একটা রুমে ঘুমাই। উনি এসে খুব দরজা ধাক্কাচ্ছেন। আমরা ঘুম থেকে উঠে বললাম, কি হইছে? কি হইছে? উনি বললেন যে, “তোরা কি মরে গেছিস নাকি? সব শেষ হয়ে যাচ্ছে।” আমি

বললাম, কি বলছেন আপনি সব শেষ হয়ে যাচ্ছে! উনি বললেন, "ছাদে যা।" আমাদের বাড়ীটা তিনতলা, তিনতলার ছাদে গিয়ে দেখি যে শহীদ মিনার এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটির এলাকার দিকে অনেক বিস্ফোরণের আওয়াজ। ট্রেসার বুলেটের অনেক আলো হয়, সেই আলোটা দেখা যায় এবং গোলাগুলির আওয়াজ আমরা শুনতে পেলাম। সেই রাত্রে আমরা কিছুই বুঝতে পারলাম না আসলে কি হতে যাচ্ছে। পরদিন সকালে আমার তিন নম্বর ভাই, উনি একজন সাবেক রাষ্ট্রদূত, উনি বললেন যে, বিবিসিতে বলছে যে আর্মি ক্র্যাকডাউন করেছে। তারপর সকালবেলা ৯টার দিকে রেডিও পাকিস্তান থেকে ঘোষণা আসলো, ইয়াহিয়া খান ভাষণ দেবে। আমরা সেই ভাষণটা শুনলাম। সেই ভাষণের মোদ্দা কথা হলো যে, শেখ মুজিবুর রহমান দেশকে ধ্বংস করার জন্য চেষ্টা করছে। আওয়ামীলীগ তাকে সহযোগীতা করতেছে। সেজন্য তাদেরকে শায়েস্তা করার জন্য, দেশকে বাঁচানোর জন্য পাকিস্তান আর্মি মাঠে নেমেছে এবং তারা জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছে। ঐদিন বেলা ১২টার দিক থেকে ২টা পর্যন্ত কারফিউ শিথিল করা হয়েছিলো, ঐদিন থেকে কারফিউ জারী করা হয়েছিলো। ১২টা থেকে ২টা পর্যন্ত কারফিউ থাকবে না। আমাদের পাড়াতে বন্ধু-বান্ধবরা কারফিউর মধ্যেও আসলো, তো আমরা বললাম চল, আমরা দেখে আসি কোথায় কি হলো। একজন এসএসসি পরীক্ষার্থী ১৪-১৫ বছরের ছেলে, তাদের তো অত চিন্তাধারা নেই যে কি হতে পারে বা কি বিপদ আসতেছে। আমাদের বাসা থেকে দুই কি আড়াই কিলোমিটার দূরে জগন্নাথ হল। আমরা আমাদের বাসা থেকে সোজা যে রাস্তা গেছে, সেটাই জগন্নাথ হল ক্রস করে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছে, সেই পথে হাটতে হাটতে জগন্নাথ হলের দিকে গেলাম। গিয়ে দেখি যে মাঠের মধ্যে অনেক মাটির গর্ত করা। ওখানে ভিতরে গিয়ে দেখি যে অনেকগুলো ডেডবডি আছে। ঠিকমত বুঝা যায়না, দুই একটার হাত বেরিয়ে আছে। দুই একজনের মাথার চুল দেখা যাচ্ছে। এরকম অনেকগুলো বডি দেখলাম কিন্তু কতগুলো বডি, সেটা বলতে পারবনা। তারপর ওখান থেকে হাটতে হাটতে ইকবাল হল যেটা বর্তমানে জহুরুল হক হল, ওখানে গেলাম। ওখানে ৩ টা ডেড বডি দেখলাম। জহুরুল হক হলের গেটের মুখে একটা পুলিশের ডেড বডি আর ক্যান্টিনের ছাদে একটা মাঝ বয়েসী লোক ও একটা ছেলের ডেড বডি দেখলাম। ওখান থেকে আমরা পলাশীর ফায়ারব্রিগেডের দিকে গেলাম। ওখানে গিয়ে আমি ২৩টা ফায়ারম্যানের লাশ দেখতে পেলাম। ওদেরকে এক সাড়িতে মারা হয়েছে। এই

জিনিসগুলো দেখে আমার মনে হলো যে আমরা বোধহয় শেষ হয়ে গেলাম, ধ্বংস হয়ে গেলাম, আমাদের বাঙ্গালির আর কোনো আশা ভরসা রইলনা। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেলো এবং খুব অসহায় লাগছিলো। ২৬ তারিখ সন্ধ্যার দিকে আমাদের বাসায় একটা মিটিং হলো। আমাদের বাসার ৩ তলার ভাড়াটিয়ার ২টা ছেলে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। আমার সেজ ভাই ইউনিভার্সিটির লেকচারার। আমরা সব ভাইয়েরা মিলে বসলাম এখন আমাদের কি করা উচিৎ বা করণীয় কি? তখন তো আমাদের সামরিক কলাকৌশল সম্বন্ধে কোনো ধারণাই ছিল না, তাই যার যেটা মনে হচ্ছে, সেটা বলতেছে। মিটিং এ সিদ্ধান্ত হল যে আমরা আর্মিকে ঠেকানোর জন্য ব্যারিকেড দিব, আমাদের ওখানে কংকৃটের বড় বড় পাইপ পড়ে ছিলো, কনস্ট্রাকশন কাজের জন্য আনা হয়েছিলো, একটা নষ্ট পিকাপ ছিল, এগুলো দিয়ে রাস্তায় ব্যারিকেড দেয়ার চিন্তা করলাম। সেভাবে আমরা আমাদের বাসা থেকে প্রায় এক কিলোমিটার পর্যন্ত এলাকায় যতগুলো পাইপ পেয়েছিলাম, সেগুলোকে দিয়ে ব্যারিকেড দিলাম। ২৬ তারিখ পার হয়ে গেলো। ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় চট্রগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে ৮ ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এর বিদ্রোহের কথা জানতে পারলাম। এ খবরটা আমাদের অনেক উজ্জীবিত করেছিল। ২৯ কি ৩০ তারিখের দিকে আমাদের বাসায় আরেকটা মিটিং অনুষ্ঠিত হল। যারা আগের দিনের মিটিং এ ছিল, তারা থাকলো। আমরা আলোচনা করতে লাগলাম, আমরা যে ব্যারিকেড দিলাম, তা দেখে যদি আর্মি আমাদের এলাকার লোকজনদের মেরে ফেলে, তাহলে কি হবে? আর এধরনের ব্যারিকেড তো কিছুইনা, একটা ধাক্কা দিলেই তো সরে যাবে। তখন আবার সিদ্ধান্ত হলো, আমরা ব্যারিকেডগুলো সরিয়ে দিব, কারণ এতে কোনো লাভ নেই। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা ব্যারিকেড গুলো সরিয়ে ফেললাম। এভাবে ২রা এপ্রিল পর্যন্ত আমরা পার করে দিলাম। ২রা এপ্রিল থেকে ঢাকা শহরে কারফিউটাকে শিথিল করে ফেলা হয়েছে। দিনের বেলা কোনো কারফিউ নেই, রাতের বেলা শুধু কারফিউ বহাল রাখা হলো। তো আমাদের বাসার সামনের রাস্তাটা উর্দূরোড হয়ে একদম চকবাজার হয়ে বুড়িগঙ্গা নদীর দিকে গিয়েছে। ২রা এপ্রিল থেকে দেখছি যে, হাজার হাজার লোক ঢাকা শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ভাবতে লাগলাম আমরা কোথায় যাবো? আমাদের গ্রামের বাড়ী চিটাগাং। সেখানে যাওয়ার মতো রাস্তাঘাটে গাড়িঘোড়ার তেমন কোনো ব্যাবস্থা নেই। এছাড়া ঢাকার কাছাকাছি কোনো গ্রামেরও তেমন কেউ পরিচিত নেই। এভাবে ২-৩ দিন ধরে আমরা দেখলাম যে হাজার হাজার লোক

বুড়িগঙ্গা নদী পার হয়ে ঐদিকে গেলো। পরে জানতে পারলাম যে এই পলায়নরত বাঙ্গালিদের উপর পাকিস্তান আর্মি নির্বিচারে গুলি চালিয়েছে। অসংখ্য লোক মারা গিয়েছে। তার নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা আমি বলতে পারবনা। এরপর আমাদের তো হাতে কোনো কাজ নেই। ঐ বয়সী ছেলেরা তো ঘরে বসে থাকেনা। আমরা মেডিকেল কলেজের হোস্টেলের ভিতরে একটা পুকুর ছিলো, সেখানে গিয়ে মাছ ধরতাম। এভাবেই আমাদের দিনগুলো পার হতে লাগলো। এরপর ১৭ই এপ্রিলে আমাদের স্বাধীন বাংলা সরকার গঠিত হলো এবং জয়বাংলা বেতার কেন্দ্রের সম্প্রচার শুনতে পেলাম। অনেক ভেবেচিন্তে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবো। কিন্তু আমরা আমাদের ঐ বয়সে ফরিদপুর, কুষ্টিয়া বা মেহেরপুর ঐ এলাকাগুলোতে কখনো যাইনি, কিভাবে যেতে হয় তাও আমরা জানিনা। আমরা ম্যাপ দেখে দেখে মেহেরপুরের আম্রকানন, যেখান থেকে আমাদের স্বাধীনতার প্রবাসী সরকার গঠিত হয়েছিল, সেখানে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব না। এখনকার মত এত আধুনিক ম্যাপ তখন ছিল না। আমাদের কাছে ব্রিটিশ একটা এটলাস ছিলো। বাংলাদেশের একটা ডিটেইলড ম্যাপ পেলাম। আমরা দেখলাম যে আমরা যদি কুমিল্লা দিয়ে ভারতে যাই, তাহলে এটা সহজ হবে। এভাবে প্ল্যান করে আমরা ৭ জন বন্ধু বাড়িতে কিছু না বলে বেরিয়ে পরলাম। আমি আমার বড় বোনকে বললাম যে, একজায়গায় লুটের কিছু শাড়ী কাপড় বিক্রি করতেছে, তুমি কিনবে নাকি? তখন একটা শাড়ীর দাম ১০-১৫ টাকা। ওকে এগুলো বলে ওর কাছ থেকে ৫০ টাকা নিয়ে আমরা সবাই একসাথে বেরিয়ে পরলাম। প্রথমে আমরা সদরঘাট গেলাম। ওখান থেকে আমরা লঞ্চে করে রামচন্দ্রপুর গেলাম। এটা ছিলো মুরাদনগর বা হোমনাতে। রামচন্দ্রপুরে আমরা সন্ধ্যায় পৌঁছলাম। ওখানে পৌঁছে আমরা এলাকার লোকজনকে জিজ্ঞেস করলাম ওপারে কিভাবে যাবো। ওখানে এলাকার লোকজন আমাদেরকে রাতের বেলায় যেতে নিষেধ করে রাতটা ওনাদের কাছে কাটিয়ে ভোরবেলা চলে যেতে বললেন। তখনকার সময়ে গ্রামের কোনো বাড়িতে একসাথে ৭ জনের খাবারের ব্যাবস্থা করা ছিলো খুবই কঠিন ব্যাপার। আমরা যে ভদ্রলোকের বাড়িতে ছিলাম, উনি আমাদেরকে একটা গামলাতে করে প্রায় কেজি খানেকের বেশি মুড়ি আর এক টুকরো বড় খেজুরের গুড় দিলেন। আমরা ওটা খেয়েই রাতটা পার করে দিলাম। ভোরবেলা ওনারাই আমাদের জাগিয়ে দিলেন। আমাদেরকে চা আর মুড়ি খেতে দিলেন। এরপর একটা রাস্তা দেখিয়ে দিলেন আর বললেন যে এই রাস্তা ধরে

লোকজনকে জিজ্ঞেস করতে করতে এগিয়ে যাও। আমরা এগিয়ে যেতে লাগলাম। লোকেরা আমাদের বিভিন্নভাবে পথ দেখিয়ে দিতে লাগলো। হয়ত ওনারা যে পথটুকুকে ৩ মাইল বলল, প্র্যাক্টিক্যালি দেখা গেলো তা প্রায় ১৫ মাইল। এই করতে করতে আমরা সন্ধ্যা নাগাদ ত্রিপুরার কোনা বনে গিয়ে পৌঁছলাম। ওখানে পৌঁছানোর পরে বিএসএফ আমাদেরকে এক জায়গায় জড়ো করে রাখলো। তার পরদিন বিএসএফ আমাদেরকে আমাদের কাগজপত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলো। আমাদের কাছে দেখানোর মত কোনো কাগজপত্র ছিলোনা। ওরা আমাদের কাছে অন্তঃত ছাত্রলীগের সদস্য পরিচয়পত্র দেখতে চাইলো। আমাদের কাছে তাও ছিলোনা। তখন ওরা আমাদেরকে বলল যে, তোমাদের আমরা এখানে ঢুকতে দিতে পারিনা। এভাবে আমরা ওখানে ২দিন থাকলাম। কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করতে পারলাম না। আমাদের মন খারাপ হয়ে গেলো। সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমরা আবার দেশে ফিরে যাই। যে পথে আমরা ওখানে গিয়েছিলাম, সেই পথ ধরেই আমরা আবার ফিরে আসলাম এবং দেশে ফিরে আসার পর আমাদের মাথা থেকে মুক্তিযুদ্ধের ভূত নেমে গেলো। আমরা অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুই তো করতে পারলাম না। এদিকে আস্তে আস্তে ঢাকা শহর স্বাভাবিক হতে শুরু করলো। এপ্রিলের ২৬ বা ২৭ তারিখের দিকে আমরা দেশে ফিরে এসে সেই মাছ ধরার কাজে লেগে গেলাম। আর রেডিওতে জয় বাংলা বেতার কেন্দ্রের কিছু খবর শুনে দিন পার করতে লাগলাম। এভাবে মে মাসের মাঝামাঝি সময় অতিক্রম হবার পর আমার কাছে কিছু ছেলে দেখা করতে আসলো। তাদের উদ্দেশ্য জিজ্ঞেস করতে তারা বলল যে, আপনি তো ইন্ডিয়া গিয়েছিলেন। এ কথা শুনে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। ভাবতে লাগলাম যে এরা কি করে জানলো যে আমি ইন্ডিয়া গিয়েছিলাম? এখন যদি এরা আমাকে পাকিস্তান আর্মির কাছে ধরিয়ে দেয়? আমি উত্তর দিলাম, ভাই আমি তো ইন্ডিয়া যাইনি। আর আমার ইন্ডিয়া যাওয়ার প্রশ্নই ওঠেনা। আমরা হলাম মুসলিম লীগ। আমাদের বাপ-দাদারা সবাই মুসলিম লীগ করত। আমরা পাকিস্তানের পক্ষের লোক। এগুলো বলে ওদেরকে বিদায় করে দিলাম। ক'দিন পরে ঐ ছেলেগুলোর সাথে আমার এক বন্ধুও আমার সাথে দেখা করতে আসলো। আমার বন্ধু আমাকে বললো যে, দোস্ত, এরা সত্যি সত্যিই ইন্ডিয়া যেতে চায়। তখন আমি যেভাবে যেভাবে ইন্ডিয়া গিয়েছিলাম, সেভাবে সেভাবে ওদেরকে একটা ধারণা দিতে লাগলাম। এভাবে ৩০ মে ওরা এসে বলল যে, আগামীকাল ওরা ইন্ডিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা করবে। ওদের সাথে কথা বলতে বলতে এক পর্যায়ে

আমারও ওদের সাথে যেতে ইচ্ছে জাগলো। এরপর আমরাও সিদ্ধান্ত নিলাম যে ওদের সাথে যাবো। আমাদের দলে মোট ১২ জন ছেলে ছিলাম। আমার এক বন্ধু ছিলো মিকি যার বড় ভাই, জিয়া ভাই, যিনি ক্র্যাকপ্লাটুনে ছিলেন। সেই মিকি আর আমি ২ জন আর ওদের থেকে ১০ জনের আসার কথা। তো আমরা সদরঘাটে গিয়ে দেখি ওদের থেকে মাত্র ২ জন আসছে, বাকি ৮ জনই আসেনি। আমরা ২ জন, মোট ৪ জন। তো এই ৪ জনই আমরা লঞ্চে উঠলাম। মে মাসের ৩১ তারিখে কিন্তু আর্মি অলমোস্ট সব জায়গাতেই ডেপলয় হয়ে গিয়েছে। যাই হোক, আমরা যে লঞ্চটাতে চললাম, সেটা মুন্সীগঞ্জের কাঠপট্টিতে থামল। সেখানে থামার পরে দেখলাম যে এফএফ রেজিমেন্ট, ফ্রন্টিয়ার ফোর্স পাকিস্তানের দুই সদস্য লঞ্চটিতে উঠলো যাদেরকে আমরা পাঠান বলি। ওরা এসেই আমাদের এক এক জনকে জিজ্ঞেস করতে শুরু করল "তুমি কি করো? তুমি কি করো?" ততদিনে আমাদের প্রত্যেকের ঢাকা শহরের আইডেন্টিকার্ড তৈরি হয়ে গিয়েছে। যেমন আমার আইডি কার্ডে লেখা ছিল প্রুফ রিডার। এটা প্রত্যেকে যে যেভাবে পারছে তৈরি করে নিয়েছে। যেহেতু আমি পুরান ঢাকার ছেলে ছিলাম, আমাদের পুরান ঢাকার মানুষজন কিছুটা উর্দু ভাষায় কথা বলে। সেই সুবাদে আমি কিছু উর্দু বলতে পারতাম কিংবা বুঝতে পারতাম। তখন সেই দু'জন পাকিস্তানি সোলজার আমাকে জিজ্ঞেস করল, "এ কোচে, তু কেয়া কারতা হায়?" তো আমি জবাবে বললাম “মে নক্রি করতাহুঁ।“ জিজ্ঞেস করল, কিধার? আমি বললাম মৌলভীবাজার মে। আবার জিজ্ঞেস করল কেয়া নকড়ি? আমি বললাম প্রুফ রিডার। এটা বলার পরে সে আমাকে জিজ্ঞেস করল তুমি মৌলভীবাজারের খান সাব কে চেনো নাকি? আমি বুঝতে পারছিলাম না যে সে কোন খান সাব সম্বন্ধে জানতে চাচ্ছিলো। তবে আমার জানামতে মৌলভীবাজারে ঢোকার মুখে দু'জন পাঠান ছিল যারা টোবাকো বিজনেস করত। তা ভাবলাম বলে দিই যা হবার হবে। বললাম হ্যাঁ চিনি। তখন জিজ্ঞেস করল ওলোগ কিয়া কারতে হে? আমি বললাম টোবাকো বিজনেস করে। শুনে ও খুশি হয়ে গেলো। অর্থাৎ ওর সাথে মিলে গেল। এরপর ওরা আমাকে জিজ্ঞেস করল তুমি কোথায় যাচ্ছ? তো আমি বললাম আমি নানা বাড়ি যাচ্ছি। আমার মা ওখানে আছে। জবাবে জিজ্ঞেস করল কবে ফেরত যাবে? আমি বললাম সাতদিন পরে। এর পর ও বলল ঠিক আছে যাওয়ার সময় আমার সাথে সাক্ষাৎ করো এবং সালাম দিও। এরপর ওরা আমার পাশের বন্ধুকে জিজ্ঞেস করল তুম কেয়া করতা হে? জবাবে আমার বন্ধুটা ভয়

পেয়ে “আমি ছাত্র” বলে দিল। ওরা ছাত্র শব্দটা বুঝতে পারল না। তাই ওরা উপস্থিত শিক্ষক কে বললো এই ছেলে কি করে? তখন শিক্ষক, স্টুডেন্ট বলে দিল। ছাত্র শুনেই ওরা খেপে গেলো। ওরা তো তখন আমার ঐ বন্ধুটাকে ধরে নিয়ে গুলি মেরে দিবে, মেরে ফেলবে, এই সব বলতে শুরু করল। আমি তখন ওদের পা ধরে অনেক বুঝাতে চেষ্টা করলাম যে ও খুব ভালো ছেলে। তো যাই হোক ওরা কিছু করলো না। এর মধ্যে একটা কলা ওয়ালা আসলো, ওরা কলা ওয়ালার কাছ থেকে দুটো কলা ছিড়ে নিল, একটা আমাকে দিলো। আমি কলা খেলাম। তো ওরা আমাদের কিছু করলো না, খালি ছাত্র বলার কারণে ওই ছেলেটাকে একটা থাপ্পর দিল। তো যাহোক, আমরা লঞ্চ থেকে রামচন্দ্রপুর নামলাম। ওখানে নেমে একটা বাড়িতে থাকলাম। পরের দিন আমরা ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ কলেজের সামনে দিয়ে একদম ব্রাহ্মণবাড়িয়া কুমিল্লা মেইনরোড যেটা আছে, সেটাতে পাকিস্তানি আর্মিরা পেট্রোল দেয় ওখানে পৌছলাম। তাদের সাঁজোয়া গাড়িগুলোতে লং রেঞ্জ এর মেশিনগান লাগানো রয়েছে। তারা চাইলেই দূর থেকে ফায়ার করতে পারে। যেহেতু আমরা গ্রামের ছেলে না শহরের ছেলে, গ্রামের ছেলেদের মত আমরা লুঙ্গি পরি না, প্যান্ট-শার্ট পরি। তাই সেখানকার চেয়ারম্যান আমাদেরকে সেই রাস্তায় যেতে নিষেধ করল। বলল এখন যেওনা, এখন সেখানে বিপদ আছে। তখন দুপুর তিনটার মতো বাজে, আমরা চেয়ারম্যানের বাড়িতে দুপুরে খাওয়া দাওয়া করলাম। সন্ধ্যার দিকে উনি আমাদেরকে একজন লোক সাথে দিলেন। তার সহযোগিতায় আমরা সেই রোড পার হয়ে গেলাম। সেখান থেকে হাটতে হাটতে আমরা ঢাকা চিটাগাং রেললাইন পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। রেললাইন পার হয়ে এক কিলোমিটার পরে হচ্ছে ইন্ডিয়া ত্রিপুরা। আমরা এবার সোনামুড়া দিয়ে ঢুকলাম। এবার ঢোকার সময় আমাদের তেমন কোন প্রবলেম হয়নি। ঢুকে গেলাম এবং সেখানে একটা ঘরে আমরা আশ্রয় নিলাম। সেখান থেকে আমরা পরের দিন সকালে চান্দের গাড়ি করে আগরতলা গেলাম। সেটা ছিল জুনের ১ তারিখ। আগরতলা যাওয়ার পরে আমরা কংগ্রেস ভবনে গেলাম যা ছিল আগরতলা শহরে। ওখানে যাওয়ার পরে কয়েকজনের সাথে দেখা হল, ওরা আমাদেরকে একটা ইয়ুথ ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিল। ইয়ুথ ক্যাম্প এ আমি সাত দিনের মত ছিলাম। ওখানে যাওয়ার পরে আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। এখানে কোন অস্ত্রসস্ত্র ট্রেনিং নেই। ওখানে শুধু লেফট রাইট করায় আর জঙ্গলে গিয়ে লাকড়ি কাটতে হয় রান্নাবান্নার জন্য, যেটাকে ফেটিগ ডিউটি বলে।

এভাবে সাতদিন করার পরে আমার কাছে মনে হল যে আমি এখানে আসছি কেন? তখন সৈয়দ নজরুল ইসলাম আমাদের যিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ছিলেন, তার নাতি ওখানে ছিলেন। উনি হয়তো আমার থেকে ৫-৬ বছরের বড় হবেন। উনি হয়তো কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে পড়তেন আমার ঠিক জানা ছিল না। উনি বললেন যে, উনি ক্যালকাটা যাবেন। আমি ওনার কাছে বললাম যে, আমাকে আপনি আপনার সাথে ক্যালকাটা নিয়ে যান। উনি রাজি হয়ে গেলেন। তখন আমি আমার বন্ধুকে বললাম যে আমি কলকাতা যাচ্ছি, তুই যাবি কিনা। ও বলল যে, না কলকাতা যাবো না। কলকাতা কিভাবে যাব এত দূরে? আমি উনার সাথে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। ত্রিপুরা থেকে যে কলকাতা কতদূর, তা আপনারা ম্যাপ দেখলে বুঝতে পারবেন। ত্রিপুরার আগরতলা হলো আমাদের ম্যাপের পূর্বদিকে, আর কলকাতা হলো আমাদের ম্যাপের পশ্চিম দক্ষিণ কোণে। তার মানে পুরো বাংলাদেশ ঘুরে সেখানে যেতে হয়। আমরা আগরতলা থেকে বাসে করে ধর্মনগর গেলাম। এটা ছিল খুবই পাহাড়ি রাস্তা। অনেক লোকজন বমি করতে লাগলো। ধর্মনগর থেকে আমরা ট্রেনে করে আসামের লামডিং গেলাম। লামডিং থেকে গুয়াহাটি গেলাম। গুয়াহাটি থেকে আমরা খেজুরিয়া মাঠ হয়ে ফারাক্কা ব্রিজ পার হয়ে চার দিন বসে কোলকাতা পৌছালাম। সেখানে পৌছে আমরা দুই বন্ধু গেলাম বাংলাদেশ মিশনে। ততদিনে বাংলাদেশ হাইকমিশন যেটা পাকিস্তান হাইকমিশন ছিল, সেটা বাংলাদেশের পক্ষে চলে এসেছে। ওখানে যাওয়ার পরে আমাদেরকে বলল, তোমরা ফর্টি ফাইভ প্রিন্সেপ স্ট্রীট ধর্মতলা তে ডঃ বিধান চন্দ্র সেন (ওয়েস্ট বেঙ্গলের একসময় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন), উনার বাড়িতে যাও, ওখানে মুক্তিযোদ্ধাদের সিলেকশন হয়। ওখানে গেলাম। এখানে তিন চার তলার একটা বাড়ি। সেই বাড়িতে জয় বাংলা অফিস করা হয়েছে। ওখানে যাওয়ার পরে ঢাকার একটা ছেলের সাথে পরিচয় হলো। সেই ছেলেটা আমাদেরকে বলল তুমি তাড়াতাড়ি একটা জায়গা দখল করে নাও, এখানেই আমাদেরকে থাকতে হবে। আমি তাড়াতাড়ি আমার কাছে একটা ব্যাগ ছিল, সেই ব্যাগটা রাখলাম, ব্যাগ থেকে একটা চাদর বের করে বিছিয়ে দিলাম। ওখানে দুদিন অতিবাহিত হল। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের এমপিএ (মেম্বার অফ দি প্রভিরিয়ান অ্যাসেম্বলী) জনাব নুর ইসলাম মঞ্জু, উনার সাথে দেখা। উনি আমাদেরকে বললেন, তোমরা ৯ নম্বর সেক্টরের তোকিপুরে চলে যাও। ওখান থেকে আমরা ৭-৮ জন ট্রেনে করে ২৪ পরগনার তোকিপুর ক্যাম্পে চলে গেলাম।

সেটা ছিল হাসনাবাদ থানার একটা ক্যাম্প। ওখানে যাওয়ার পরে আমরা দুই তিন দিন ছিলাম। তারপর সেখানে ভারতীয় আর্মিদের ট্রাক আসলো। তারপর সেই ট্রাকে উঠিয়ে আমাদেরকে একটা ট্রেনিং ক্যাম্পে নিয়ে গেল। ইন্ডিয়ান ট্রেনিং ক্যাম্প চাকুলিয়াতে। সেখানে একুশ দিন ট্রেনিং করে আমরা আবার তোকিপুর ক্যাম্পে ফেরত আসলাম। ক্যাম্পে আসার পরে আমাদের প্রথম একটা অপারেশনে পাঠানো হলো। আমাদেরকে নির্দেশনা দেয়া হলো যে, তোমরা বাংলাদেশের ভিতরে গিয়ে ছোটখাটো অপারেশন পরিচালনা করবে। ছোটখাটো অপারেশন বলতে আর্মিদের কোন ছোটখাটো ট্রুপসের উপরে অতর্কিত আক্রমণ কিংবা মাইন বসিয়ে কোন ট্রাক ধ্বংস করা, বিভিন্ন জায়গার সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা ইত্যাদি ইত্যাদি। তো প্রথমবার আমরা সেরকম কোনো সুবিধা করতে পারলাম না। কারণ ওই এলাকাতে অনেক বাংলাদেশ বিরোধী লোকজন ছিল এবং আমাদের মুভমেন্ট অনেক রেস্ট্রিক্টেড ছিল। সেই অপারেশনে আমরা কিছু টেলিফোনের তার বিচ্ছিন্ন করেছিলাম এবং কিছু গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলাম, এগুলো করেই ফিরে এসেছিলাম। আমরা তেমন বেশি কোন ক্ষয়ক্ষতি করতে পারিনি, তখন মুক্তিযুদ্ধ কেবল ইনিশিয়াল স্টেজে ছিল। এই অপারেশনে আমাদের মেজর কোন সাকসেস আসেনি। যদিও আমরা যুদ্ধের মুডে ছিলাম কিন্তু কোন যুদ্ধ করতে পারিনি। অপারেশন শেষ করে এসে আমি তিন দিনের ছুটিতে কলকাতা গেলাম এবং আমার চাচা তখন কলকাতায় থাকতেন, তিনি ভারতীয় নাগরিক ছিলেন। আমার কাছে উনার ঠিকানা ভুল থাকার কারণে আমি ওনাকে প্রথমবার খুঁজে পাইনি। এইবার ছুটিতে গিয়ে আমি ভাবলাম যে আমি একটু আশেপাশে খুজবো। খোঁজাখুজি করে আমি তার সাক্ষাৎ পেয়ে গেলাম। আমার চাচা আমাকে পেয়ে বললেন, "কিসের মুক্তিযুদ্ধ? তুমি আর যেতে পারবে না, আমার এখানে থাকো, আমি তোমাকে স্কুলে ক্লাস টেনে ভর্তি করিয়ে দিব, তুমি আর যেতে পারবেনা। আমি তোমার বাবাকে কি জবাব দেবো?" উনি তো আমাকে ছাড়ছেন না, তাই আমিও ভাবলাম ঠিক আছে থাকিনা দু'একদিন। এর পরের দিন আমি কলকাতা নিউমার্কেটে গেলাম। ভাবলাম যদি দু'একটা শাড়ি কাপড় কিনে নিয়ে যেতে পারি, যেহেতু আমি আমার বোনের কাছ থেকে মিথ্যে কথা বলে টাকা নিয়ে এসেছিলাম। শাড়ির দাম তখন খুব একটা বেশি না, ২০-২৫ টাকা। তো কলকাতা নিউমার্কেটে হঠাৎ করে দুজন লোককে ঘুরতে দেখলাম যাদের মধ্যে একজনকে আমার খুব পরিচিত মনে হল, আমি তাদের পিছনে প্রায়

আধাঘণ্টা ঘুরলাম। ঘোরার পরে আমি তাদের সামনে গিয়ে বললাম এক্সিউজ মি, আপনি কি ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরী? তিনি উত্তর দিলেন হ্যাঁ, তুমি কে? আমি বললাম আমি তোমার ছোট ভাই।

ভাই বোনদের সাথে
বীর মুক্তিযোদ্ধা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (প্রকৌশলী) শহীদউল্লাহ চৌধুরী, এনডিসি (অবঃ)

তিনি বললেন তুমি এখানে কি করো? আমি বললাম, আমিতো মুক্তিযুদ্ধের জন্য এখানে আসছি। আমি এখন ছুটিতে চাচার বাসায় উঠেছি। আমার ভাই আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং আমার সাথে আমার চাচার বাসায় গেলেন। তিনি আমার চাচার সাথে দেখা করলেন, আমার চাচা বললেন, "ওকে তো ছাড়া যাবে না। কোথায় গিয়ে বেঘোরে প্রাণ দিবে।" আমার ভাই বললেন, "ঠিক আছে, দেখা যাবে।" আমার ভাইয়ের সাথে ছিলেন ডঃ মুবিন। ত্রিপুরার বিশামগঞ্জে একটা হাসপাতাল হয়েছিল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য। ওনারা দুজন মিলে ওই হাসপাতালটি তৈরি করেছিলেন। আমি আমার বড় ভাই এবং ডঃ মুবিন এর সাথে ৮ নম্বর থিয়েটার রোডে গেলাম যেখানে বাংলাদেশ ফোর্সেস হেডকোয়ার্টার। উনারা আমাকে জেনারেল ওসমানী সাহেবের কাছে নিয়ে গেলেন। উনি তখন কর্নেল ওসমানী। আমার ভাই আমাকে ওনার কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন যে, " Sir, he is my youngest brother. He is loitering in Calcutta City. You should send him to a camp." কর্নেল ওসমানী আমাকে বললেন যে, "তোমার বাসা কোথায়?" আমি বললাম, ঢাকাতে। উনি বললেন, "তাহলে তো তুমি এখানে কিছু করতে পারবে না। তোমাকে আমরা সেক্টর টু তে মেলাঘরে পাঠিয়ে

দিবো, ওরা ঢাকায় অপারেশন করে।" সেই কথা মোতাবেক আমার ভাই আমাকে এবং ডঃ মুবিন কে প্লেনের দুটো টিকিট কেটে দিলেন। প্লেনটি যাবে কলকাতা গুয়াহাটি হয়ে আগরতলা। বাংলাদেশের উপর দিয়ে ইন্ডিয়ান এয়ারক্রাফটের জন্য তখন নো ফ্লাই জোন ডিক্লেয়ার করে দেয়ার কারণে প্লেন চলতে পারে না। আমি আর ডক্টর মুবিন আগরতলা এসে মেলাঘর ক্যাম্পে গেলাম যেটা সেক্টর টু হেডকোয়ার্টার, যেটা পরবর্তীতে K Force হেডকোয়ার্টার হয়েছিল। ওখানে যাওয়ার পর আমাদের ক্যাপ্টেন হায়দারের সাথে দেখা হল। ক্যাপ্টেন হায়দার, মেজর মতিন এবং আরো ছিলেন লেফটেন্যান্ট মালেক তারপরে আরো অনেকের সাথে সাক্ষাৎ হলো। কর্নেল খালেদ মোশাররফের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে আমাদের সেখানে। আমরা ঐদিন একটা অফিসার্স মেস রয়েছে যেটা বেড়ার একটা ঘর ভিতরে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে চকি বানানো, ওটা ছিল অফিসার্স মেস, ওখানে আমাদের রাতে থাকতে দিলো। ওদের সাথে আমরা রাতে খেলাম। পরেরদিন আমাকে সুইমিং প্লাটুন ট্রান্সফার করে দিল। মেলাঘরের ওখানে ফরেস্টের একটা বাংলো ঘর ছিল, ওইখানে আমাদের সুইমিং প্লাটুনের লোকেশন ছিল, আর ঢাকা কোম্পানি, নোয়াখালী কোম্পানি, অন্যান্যরাও তাঁবুতে থাকতো। আমি সুইমিং প্লাটুনে যোগ দেওয়ার পর আমাদেরকে প্রচুর ট্রেনিং দিতে শুরু করলো। ওখানকার প্রথম ট্রেনিং ছিল, মেলাঘরের কাছে একটা লেক আছে, ওখানে একটা রাজার বাড়ি আছে, সেই লেকে প্রতিদিন ৭ থেকে ৮ কিলো সুইমিং করতে হতো। এছাড়াও আমরা এক্সপ্লোসিভ এর উপরে ট্রেনিং করতাম যেমন বিভিন্ন এক্সপ্লোসিভ কিভাবে চার্জ করতে হয়, একটা ব্রিজ কিভাবে উড়িয়ে দিতে হবে, মাইন কিভাবে উড়িয়ে দিতে হবে। যেমন এন্টি ট্যাংক মাইন, এম সিক্সটিন মাইন, এম ফর্টিন মাইন, এন্টি পার্সোনাল, প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ, কর্ডেক্স, ডেটোনেটর সমস্ত ডিটেলস জিনিসের উপর ট্রেনিং হত। তারপরে স্মল আর্মসের উপরে। এসএলআর, স্টেনগান এগুলোর উপরে ট্রেনিং হলো। এবং আমি যখন মেলাঘরে আসলাম তখন জুলাই মাস। আগস্টের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত আমার ট্রেনিং হলো। এরপর আমাদেরকে অপারেশনে পাঠাবে। আমি আমার অথরিটিকে বললাম যে, অনেকদিন দেশে যাই না, একটু দেশে যেতে চাই। তখন সিদ্ধান্ত হল যে, দাউদকান্দিতে একটা অপারেশন করবো, অপারেশন শেষ করে আমরা ঢাকাতে যাব। ২০শে আগস্ট এর দিকে ক্যাপ্টেন হায়দার, বর্তমানে কর্নেল শহীদ হায়দার, উনি আমাদেরকে বললেন, "ঢাকা দাউদকান্দি রোডটাকে আমরা

অকেজো করে দিতে চাই।" কারণ হিসেবে তিনি আমাদেরকে বললেন দাউদকান্দি থেকে ঢাকায় আসার পথে তখন কোন ব্রীজ ছিল না। দাউদকান্দিতেও কোন ব্রীজ ছিল না, বর্তমান মেঘনাতেও কোনো ব্রীজ ছিল না। এই দুটো জায়গাতে পাকিস্তান আর্মি ফেরি ব্যবহার করত। আমাদেরকে বলা হলো যে এই রাস্তাটা যদি আমরা অকেজো করে দিতে পারি, তাহলে আমাদের লাভ যেটা হবে, এদেরকে নারায়ণগঞ্জ হয়ে শীপে মুভমেন্ট করতে হবে। তাহলে সেটা ওদের জন্য অনেক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আমাদের টার্গেট দেয়া হলো যে ভাটিয়ারচর ব্রিজটি উড়িয়ে দিতে হবে এবং তারপর কয়েকটা কালভার্ট উড়িয়ে দিতে হবে। তাহলে তাদের জন্য এই রাস্তাটা মোটামুটি অকেজো হয়ে যাবে। যাহোক, পরিকল্পনা মোতাবেক আমরা প্রথমে ভাটিয়ারচর ব্রীজটি উড়িয়ে দিতে যাই। আমরা ভাটিয়ারচর ব্রীজের চারটা পিলারে কাটিং চার্জ লাগাই এবং ২০ কেজি করে এক্সপ্লোসিভ লাগাই এবং কর্ডেট দিয়ে দূরে ডেটনেটর দিয়ে ইলেকট্রিক ব্যাটারির মাধ্যমে এই ব্রীজটাকে উড়িয়ে দেই। সেই অপারেশন শেষ করে আমরা চলে আসি। এরপর আমরা সেকেন্ড যে অপারেশনে যাচ্ছি, সেখানে ফোকাস করব আমি। আমাদেরকে বলা হল যে ভাটিয়ারচর ব্রীজটা উড়িয়ে দেয়ার পর ওরা ফেরী চালু করে দিয়েছে। পারপাজটা আমাদের কিন্তু পুরোপুরি সার্ভ হয়নি। এবার আমাদেরকে একটা ডিটেইল প্ল্যান করে যেতে বলা হলো। বেশকিছুদিন থাকার প্ল্যান করে যেতে হবে। তখন আমাদের কমান্ডার ছিলেন রফিক ভাই। উনি গজারিয়ার। পরবর্তীতে উনি এই অপারেশনের কারণে বীরপ্রতীক খেতাব পেয়েছিলেন। আমরা প্রায় ২০ জনের মত গেলাম। আমার সাথে জাকির ভাই, চাঁদপুরের কালাম, আরও অনেকে ছিল যাদের নাম এখন স্মরণ নেই। এই অপারেশনটার জন্য আমাদের টার্গেট ছিলো আমরা ফেরীটা উড়াবো, তারপর ভবেরচর, বাউষ্যার ঐ সাইডের মোট ৪ টা কালভার্ট উড়াবো। যাতে করে আর্মি যেন কোনো অবস্থাতেই এই রাস্তাটা আর ব্যাবহার করতে না পারে। ২৭ তারিখের দিকে ভারত থেকে আমাদের টিম নিয়ে আমরা চলে যাই। টিম নিয়ে আমরা একটা হাইড আউটে থাকি। হাইড আউট থেকে আমরা একটা নৌকা নিয়ে ফেরীটাকে উড়ানোর প্ল্যান করি। এর আগে আমাদের একটা রেকি টিম গিয়ে দেখে আসে যে ফেরীটা ঐ পারে থাকে অর্থাৎ ঢাকার সাইডে। ওখানে বাধা থাকে এবং কিছু আনসার রাজাকার ফেরীগুলোকে পাহারা দেয়। আমরা যেটা লক্ষ্য করলাম যে সেই আনসার রাজাকাররা অতটা প্রশিক্ষিত নয়। তাদেরকে

রাইফেল ধরিয়ে দিয়ে ডিউটিতে রেখেছে মাত্র। প্ল্যান হলো, আমাদের একটা টিম আগে নামিয়ে দিবো যারা আগে গিয়ে আনসার রাজাকারদের নিউট্রালাইজ করবে এবং ফেরীর দুটো ইঞ্জিনে এক্সপ্লোসিভ লাগিয়ে অকেজো করে দিতে পারলেই পুরো ফেরীই অকেজো হয়ে যাবে। সেই প্ল্যান মোতাবেক আমরা রাত ৩টার দিকে ফেরীটাকে উড়িয়ে দেই। আমরা ফেরীটাতে এক্সপ্লোসিভ লাগিয়ে নদীর এইপারে চলে আসি। আমাদের তো পালিয়ে যেতে হবে। ইলেকট্রিক ডেটনেটরের মাধ্যমে আমরা ফেরীটাকে উড়াই। আমরা দেখলাম যেন একটা আগুনের পিণ্ড আকাশে উড়ে গেছে, উড়ে এসে নদীর এইপারে পরেছে। এরপর ওখান থেকে আমরা হাইড আউটে আসি। তার পরের দিন আবার আমরা রেকী পেট্রল করি দেখার জন্য। দেখি ঐ এলাকায় আর রাজাকার বা অন্যকেউ নেই। তার পরের দিন এসে আমরা ভবেরচর এবং বাউষ্যার মোট চারটা কালভার্টে কাটিং চার্জ দিয়ে চারটা কালভার্ট উড়িয়ে দেই। ঐদিন রাতের বেলা আমরা আর হাইড আউটে যাইনি। কারণ আমরা ভেবে নিয়েছিলাম যে, ফেরী উড়ে গিয়েছে, কালভার্ট নেই, আমাদের মনে হচ্ছিল যে এদিকে আর কেউ আসবেনা। আমরা অনেক কনফিডেন্ট ছিলাম। ঐ রাতে আমরা রাস্তার পাশে একটা বাড়িতে ছিলাম। সকাল ৮টার দিকে নাস্তা খেয়ে আমাদের মাঝে ঐ অপারেশন নিয়ে ব্রিফিং হচ্ছিল। আমাদের মাঝে কেউ একজন বলল যে, আমরা যেখানে অপারেশনে গিয়েছিলাম, সেখানে তো আমরা এন্টি পার্সোনাল মাইন লাগিয়ে আসছি। এন্টি পার্সোনাল মাইন হলো দুইপাশে দুইটা মাইন মাঝে একটা ওয়্যার দিয়ে কানেক্ট করা। তারটা ছদ্মবেশী, তাই দেখা যায়না। তারের সাথে লাগলেই মাইনটা এক্সপ্লোজড করবে। তো আমাদের মাঝে আলোচনা হলো যে এ মাইনগুলোতে আর্মিও মারা যাবেনা, রাজাকারও মারা যাবেনা। মারা যাবে আমাদের গ্রামের সাধারন মানুষ। তাই আমাদের মাঝে সিদ্ধান্ত হলো যে এই মাইনগুলোকে আমরা ডিজার্মড করবো। আমরা ওখানে ৮ জনকে পাঠালাম। সেই ৮ জনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আরও ৫-৬ জনকে পাঠানো হলো গ্রামের মধ্যে পেট্রলিং করতে, যাতে গ্রামে আর্মি বা রাজাকার থাকলে সতর্ক করতে পারে। আর আমরা ৪ জন রাস্তার পাশে পাহারা দিচ্ছি। আমি আর কালাম রাস্তার এই পাশে একটা খড়ের গাদার আড়ালে বসে আছি। আমাদের কখনই মনে হয়নি যে আর্মি বা মিলিশিয়া আসতে পারে। একদম নির্ভয়ে ছিলাম আমরা। প্রায় বারোটার দিকে হঠাৎ করে আমরা রাস্তা দিয়ে বুটের আওয়াজ পেলাম। আমরা খুব ঘাবড়ে গেলাম যে কি হচ্ছে এটা!

আমরা আড়াল থেকে দেখলাম যে ১৫-২০ জন লোক খাকি পোশাক পড়া অস্ত্র হাতে এদিকে আসছে। আমি কালামের দিকে তাকিয়ে আছি। কি করা উচিৎ এখন? আমি যেন এখন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, ওদেরকে দেখে মনে হলো যেন আমার আত্মাটা উড়ে গেলো। হতবিহ্বল হয়ে গেলাম আমরা। আমি ভয়ে কাঁপছিলাম। মনে হচ্ছিল যেন আজ আমার জীবনের শেষ দিন। একটুপরেই আওয়াজ পেলাম, "বাড়ীওয়ালা, এ বাড়ীওয়ালা। বাড়ীওয়ালা, এ বাড়ীওয়ালা। তখন কিন্তু আমি ভয়ে প্রায় প্রস্রাব করে দেয়ার মত অবস্থা। তারা হয়ত আমাদের থেকে খুব বেশি হলে ১০-১৫ গজ দূরে ছিলো। কালাম আমার দিকে তাকিয়ে বললো, "গুলি চালা। আমি চোখ বন্ধ করেই মোটামুটি আমার স্টেনগান থেকে এলোপাতারি গুলি ছুঁড়তে শুরু করলাম। কাকে মারলাম, কোথায় মারলাম, আমার কোনো কিছু খেয়াল নেই, শুধু মাত্র ফায়ার করে আমার ম্যাগজিন খালি করে দিলাম। এরপরই শুনতে পেলাম আশেপাশের জায়গা থেকে "জয় বাংলা স্লোগান আসছে। লোকজনের আওয়াজ। আমি তখনও বুঝতে পারছিলাম না যে কি ঘটেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুনতে পাচ্ছিলাম কিছু কিছু বুটের আওয়াজ দূরে সরে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি আমরা দাড়িয়ে দেখলাম যে ওখানে প্রায় ৮-১০ জন পাকিস্তানি আর্মি পড়ে আছে। কাছে গিয়ে দেখতে পেলাম যে তারা পাকিস্তানি আর্মি না, তারা হলো মিলিশিয়া। ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্সেস। ওদের জামার কলারে লেখা রয়েছে। ওদের সাথে আবার কয়েকজন বাঙালিও ছিল। এরমধ্যে আমার কমান্ডার চলে আসলো। গ্রামবাসী তো ওদের পিটিয়ে মেরে ফেলতে চাইলো কিন্তু আমার কমান্ডার বলল যে, খবরদার! কারো গায়ে হাত দেয়া যাবেনা। কারণ আমাদেরকে বলা হয়েছিলো যে, প্রীজনার্স অফ ওয়ার বা যুদ্ধবন্দী আমাদের জন্য খুবই মূল্যবান। আপনি দেখবেন যে, ইসরাইলী ১ জন সেনার বদলে ওরা ১১০০ ফিলিস্তিনিকে ছেড়ে দেয়। তো ওখানে আমরা ৬ জনকে ইনজিউরড পেলাম। আর বাকি ৫-৬ জন মারা গিয়েছে। তো আমরা তাড়াতাড়ি গ্রামের লোকজনকে নিয়ে ঐ মৃতদের কবর দিয়ে দিলাম। আর বাকি আহতদের নিয়ে আমরা ইন্ডিয়া চলে আসলাম। এখানে বেশি সময় নষ্ট করা যাবেনা কারণ পাকিস্তান আর্মি স্পীডবোট বা হেলিকপ্টারে করে চলে আসতে পারে। ওদের মাঝে লোকালি একজন ডাক্তার পাওয়া গিয়েছিলো, তার মাধ্যমে ফাষ্টএইড দিয়ে ব্যান্ডেজ কমপ্লিট করে তাড়াতাড়ি আমরা ইন্ডিয়াতে নিয়ে যাই। আর আমি ওখান থেকে, যেহেতু আমার ছুটি, আমি লঞ্চে করে সদরঘাট চলে আসলাম। খুব

সম্ভবত সেটা ২রা সেপ্টেম্বর ছিল। সদরঘাটে পৌঁছাবার পর আমার মনে হচ্ছিল যেন সবাই আমাকে ফলো করছে, এই বোধহয় আমাকে ধরে ফেলবে। একটা রিক্স নিলাম। সদরঘাট থেকে রিক্সায় করে চকবাজার হয়ে বকশীবাজার আমার বাসায় গেলাম। তখন আমার মনে হল, আমরা কিসের জন্য যুদ্ধ করছি? সেপ্টেম্বরের ২ তারিখ আমার কাছে ঢাকা শহর মনে হয়েছে সব স্বাভাবিক। দোকানপাট খোলা, বাজার খোলা, সবকিছু খোলা। আমার বন্ধুরা এসএসসি পরীক্ষার্থী। সবাই পরীক্ষা দিয়ে রেজাল্টও পেয়ে গেছে। কিন্তু আমিতো পরীক্ষা দেইনি। আমাদের কি হবে? আমাদের ভবিষ্যৎ কি? খুবই হতাশ হয়ে গেলাম। বাসায় আসলাম। আসার পর, আমার কাজের ছেলে আমাকে চিনতে পারেনা, আমার চুল বড় হয়ে গিয়েছিলো। চেহারার পরিবর্তন হয়ে গেছে, কালো হয়ে গেছি। ঘরের বাইরে কোথাও যাইনা। এরমধ্যে আমার বড়ভাই একরামুল্লাহ চৌধুরীও চাচাতো ভাই শওকত আলী চৌধুরী কাঞ্চন, যার বাবা কলকাতাতে থাকতেন, ওনারা আমাকে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কবে যাবে?" আমি বললাম যে, আমাকে তো ৭ দিনের ছুটি দিছে। ওনারা বললেন, "আমরাও তোমার সাথে যাবো।" পরিকল্পনা হলো। আমি আর এবার ঘর থেকেই বের হইনি। কারণ কোথায় ওদের গুপ্তচর আছে, কে জানে? তো ওনারা আমার সাথে রওয়ানা দিলেন। এবার আমরা নরসিংদী দিয়ে ত্রিপুরার সোনামুড়া এলাকা দিয়ে ভারতে যাই এবং ওখান থেকে আমি ওনাদের নিয়ে মেলাঘর ক্যাম্পে আসি। এসে আমার ক্যাম্পের যিনি ইনচার্জ, ওনাদের সাথে কথা বললেন। আমার ভাইয়েরা বললেন যে, আমরা মুক্তিযুদ্ধে যেতে চাই, কিন্তু এখনই নয়। আগে আমরা একটু কলকাতা থেকে ঘুরে আসি। আমার ভাই আর ওরা চলে গেলো কলকাতায়। ওনারা অক্টোবরের দিকে আমার ক্যাম্পে আসলেন। এসেই মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিংএ অংশগ্রহণ করলেন। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ওনাদের ট্রেনিং শেষ। এরমধ্যে মোটামুটি যুদ্ধের ইন্টেন্সিটি বাড়তেছে। আমার খবর পেলাম যে, ইন্ডিয়ানরাও এটাকে দ্রুত শেষ করতে চাচ্ছে এবং আমাদের রেগুলার যে বাহিনী ছিল, তারাও অনেক ইকুয়িপড হয়েছেন। আমরা একটা গ্রুপ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। বেশিরভাগ মুক্তিযোদ্ধা দেশের ভিতরে চলে গেছে। অল্পকিছু লোক যারা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিলেন, তাদের নিয়ে একটা গ্রুপ করা হলো। আমাদের গ্রুপে প্রায় ১৪-১৫ জন পাওয়া গেলো যারা ঢাকা শহরের এবং আমার কাঞ্চন ভাই যেহেতু ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট ছিলেন, ওনাকে লিডার বানানো হলো। কাঞ্চন গ্রুপ নাম দিয়ে আমাদের

গ্রুপ হলো। আমাদেরকে নির্দেশনা দেয়া হলো যে আমরা ঢাকা শহরে ঢুকবনা। শহরের বাইরে থেকে পাকিস্তান আর্মি যাতে শহরের ভেতরে ঢুকতে না পারে, সেদিকে বাঁধা সৃষ্টি করবো। এভাবে প্ল্যান করে নভেম্বরের সেকেন্ড উইকের মধ্যেই আমরা বাংলাদেশে পৌঁছে গেলাম। নবাবগঞ্জের পাড়া গ্রামে আমরা মুক্তিযোদ্ধা টিম নিয়ে আসলাম। ওইখানে আরেকটা গ্রুপ ছিল, মোশাররফ গ্রুপ। উনারা প্রায় ৩০ জনের অধিক সদস্য নিয়ে অনেক বড় একটা গ্রুপ। ওই গ্রুপের কমান্ডার মোশাররফ ভাই, উনি বুয়েটের মেকানিক্যালের থার্ড কিংবা ফোর্থ ইয়ারের স্টুডেন্ট ছিলেন। উনার সাথে উনার আরো দুই ভাই ছিল। এক ভাই ছিল মোয়াজ্জেম, সে ঢাকা কলেজে পড়তো। আর তার ছোট ভাই ছিল মনির সে আমার সাথে এসএসসি পরীক্ষার্থী, ল্যাবরেটরি স্কুলে পড়তো। তাদের বাবা ছিল পুলিশের এসপি। তখন ওইখানে পাড়া গ্রামে থাকা অবস্থায় মোশাররফ ভাই আমাদের গ্রুপ লিডার কাঞ্চন ভাই কে বললেন, "কাঞ্চন ভাই, যেহেতু আপনারা গ্রুপ ছোট, ছোট ছোট গ্রুপের উপরে হামলা হয়। আপনাদের উপরে যদি হামলা হয়, তাহলে আপনারা কি করবেন? ভালো হয় যদি আপনারা আমাদের গ্রুপে যোগ দেন। তাহলে আমরা একটা বড় গ্রুপ হয়ে যাব, আমাদের শক্তিও বেড়ে যাবে।" কথামত আমরা মোশারফ গ্রুপে যোগ দিলাম এবং ডিসেম্বরের ফাস্ট উইক পর্যন্ত আমরা পাড়া গ্রামে ছিলাম। ওখানেই আমরা পেট্রোলিং করেছি। ওখানে তেমন আর্মি ছিল না। এরপর ইন্ডিয়ান আর্মি যখন যুদ্ধ ডিক্লেয়ার করে, তখন আমরা ওখান থেকে মোহাম্মদপুরের উল্টো দিকে বসিলা, ওখানে আমরা এসে ক্যাম্প করি। এখন আমরা সম্মুখ যুদ্ধের যে টেকনিক, সেটা অনেকটা রপ্ত করে নিয়েছি এবং আমাদেরকে বলা হয়েছে যে গেরিলা আক্রমণ থেকে বেরিয়ে এসে কিছুটা সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য। এজন্যে আমরা ওই এলাকাতে ফিজিক্যাল বাঙ্কার করি। আমাদের হাতে যে এসএমজি বা এলএমজি ছিল, সেগুলো দিয়ে আমরা এলাকায় পাহারা বসিয়েছি। এবং আমরা কিছু জায়গায় এন্টি পার্সোনাল মাইন বসিয়েছি যাতে করে আমাদের কাছে কেউ না আসতে পারে। পিছনের দিকে আমরা দুইটা পোস্ট করি যাতে পিছন দিক থেকে কোন আর্মি পালিয়ে এসে আমাদেরকে আক্রমণ করে, তাহলে তো আমরা ধরা পড়ে যাব। সে ভাবে আমরা একটা বক্ষ করে যেটাকে একটা বক্ষ ডিফেন্স সিস্টেম বলা যায়, এরকম করে আমরা আছি। ডিসেম্বরের ১৩ থেকে ১৪ তারিখের দিকে আমরা পাকিস্তানি একজন লেফটেনেন্ট সহ দশজনকে অ্যারেস্ট করি। সেই লেফটেন্যান্ট

এর নাম ছিল আফতাব বালুচ, আমার যতটুকু মনে পড়ে। যেহেতু আমাদের কাছে যুদ্ধবন্দী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই তাদেরকে অ্যারেস্ট করে আমরা রেখে দিলাম। এরপর ১৬ তারিখ বিকেল বেলা ঢাকা রেসকোর্স যেটা বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, সেখানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাংলাদেশের মিত্র বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। তখন আমাদের কাছে দিকনির্দেশনা আসলো আমরা যেন আজকে ঢাকা শহর ক্রস না করি। ১৬ তারিখ রাত ১২ টার আগে কোনো অবস্থাতেই যেন ঢাকা শহর ক্রস না করি। ১৬ তারিখ রাত দেড়টা থেকে দুইটার দিকে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমরা ঢাকা শহরে ঢুকে যাব। সেখানে আমরা বড় বড় দুইটা নৌকা জোগাড় করলাম। একটা নৌকাই সেই দশজন যুদ্ধবন্দী সাথে চার পাঁচজন পাহারাদার রাখলাম, আরেকটা নৌকাতে আমরা সবাই উঠে গেছি এবং আমি যেহেতু সুইমিং প্লাটুনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলাম, আমিতো জানি যে পানির সাথে ব্যবহার কিভাবে করতে হয়। আমি আমার পিঠের হেভারসেকের ভিতরে আমার এ্যামোনিশন বেল্টটা রাখলাম এবং আমার অস্ত্রটা একটা চাদর দিয়ে ভালো করে গিট দিয়ে রেখে দিলাম। আমরা নদী পার হচ্ছি, মাঝ নদীতে আমাদের নৌকাটা হঠাৎ করে ডুবে গেল। কি কারণে ডুবে গেল বুঝতে পারলাম না, ওভারলোড এর কারণে হতে পারে। যাহোক আমি আমার অস্ত্রসস্ত্র নৌকাতে রেখে লাফ দিয়ে নেমে গেলাম। পানিতে নামার পরে আমি দেখতে পেলাম কেউ কেউ আমার পা ধরে টানাটানি করছে, আমি লাথি মেরে ছাড়িয়ে কোনরকমে এপারে আসলাম। তখন প্রচুর ঠান্ডা, শীতে জমে যাওয়ার মত অবস্থা। ভোরের দিকে যখন আলো ফুটলো তখন খুজতেছি কে আসলো কে আসতে পারল না। কিছুই বুঝে উঠতে পারছিনা। খানিক পরে আমি আমার ভাইকে দেখতে পেলাম এবং এর খানিক পরে আমরা দেখতে পেলাম যে আমাদের মাঝে ১১ জনের কোন খোঁজ নেই। কিন্তু কোন ১১ জন সেটা বলা যাচ্ছে না। যাহোক, এর ভিতরে কারা ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিয়েছে আমি জানিনা। ফায়ার সার্ভিস আসলো। আমি তাদেরকে স্যালুট করি যে ওই সময়টাতেও তারা অ্যাক্টিভ ছিলো। এরপর আশেপাশের লোকজন এসে প্রথমে ডুবে যাওয়া নৌকাটাকে উঠালো। নৌকাতে আমার চাচাতো ভাই শওকত আলী চৌধুরী কাঞ্চনের বডি পাওয়া গেছে। ওই নৌকাতে আমার অস্ত্র, আমার ব্যাগ সব কিছু পাওয়া গেছে। যেহেতু আমি আমার অস্ত্র ফিরে পেয়েছি, সেহেতু আমি আবার কনফিডেন্স ফিরে পেলাম। তারপর দুপুর বারোটা নাগাদ অন্য সকল ডেডবডি গুলোকে উদ্ধার করা হলো। বাইরে ১০টা

ডেড বডি পাওয়া গেছে, টোটাল ১১ জন। সেদিন আমাদের ১১ জন সহযোদ্ধা শহীদ হয়ে গেল। কিন্তু আমাদের যে কমান্ডার মোশাররফ ভাই তার যে ছোট দুই ভাই, তারা কিন্তু ইস্ট পাকিস্তান জুনিয়র এবং সাব জুনিয়র সুইমিং চ্যাম্পিয়ন ছিল। কষ্ট লাগে যারা সুইমিং চ্যাম্পিয়ন, তারাও কিন্তু মারা গেলো। আপনারা যদি ঢাকার নতুন আজিমপুর কবরস্থানে যান, সেখানে গেট দিয়ে ঢোকার প্রথম হাতের ডানে তাদের ৯ টা কবর আছে।

শান্ত মরিয়ম ফাউন্ডেশনের শান্ত, সুন্দরবন কুরিয়ার এর মালিক, সে ঐ কবরগুলোকে বাঁধাই করে পাকা করে দিয়েছে। আর একটা কবর হচ্ছে মুনীরের, তাকে পলাশীতে কবর দেয়া হয়েছিল। আর বাকি একটা লাশকে মৌচাকের মোড়ে কবর দেয়া হয়েছে। এই হল ১১ জন। স্বাধীনতার ঊষালগ্নে যখন সবাই আনন্দ করছিল, তখন আমরা আনন্দ করতে পারিনি। আরেকটা কথা আমি বলি, তা হল এখানে আমি অনেক কিছু বলতে পারিনি অনেক কিছু মিস করে গিয়েছি মনে না থাকার কারণে, আমরা যারা যুদ্ধ করতে গিয়েছিলাম, আমরা কিন্তু কোন কিছু পাওয়ার আশা করে যুদ্ধ করতে যাইনি। কোন স্বার্থের জন্য যাইনি। যেহেতু আমরা চোখের সামনে দেখেছি আমাদের মা বোনদেরকে হত্যা করা হয়েছে, আমাদের ভোটের অধিকার, আমাদের শাসন করার অধিকার সবকিছু নিয়ে নিয়েছে। আমরা তাদের গোলাম হয়ে গিয়েছিলাম। এগুলোর বিরুদ্ধে যে একটা বিদ্রোহ, সেই ক্ষোভ থেকে যুদ্ধে গিয়েছিলাম। কিন্তু আজকে আমরা দেখতে পাই দুই লক্ষ দশ হাজার মুক্তিযোদ্ধা রয়েছে। কিন্তু আমার যেটা মনে হয়, যারা অস্ত্র

হাতে যুদ্ধ করেছে তাদের সংখ্যা ৭০ থেকে ৮০ হাজারের বেশি হওয়ার কথা নয়। আর যারা সহযোগী মুক্তিযোদ্ধা, যারা ডাক্তার ছিলেন, যারা গায়ক ছিলেন, যারা ফুটবলার ছিলেন, যারা অফিস চালিয়েছেন তাদের সংখ্যা হয়তো আরো ২০-৩০ হাজার হতে পারে, কিন্তু আমাদের অনেকেরই ভুলে, অনেকেরই লোভের কারণে আজকে এত মুক্তিযোদ্ধা হয়ে গিয়েছে। তবে আমি এখনো মনে করি যে এই সংখ্যাটা যাচাই করা প্রয়োজন। সত্যি কথা আমি বলতে চাই যে ১৯৭১ সালে দুইটা পরীক্ষা হয়েছিল, এসএসসি এবং এইচএসসি এবং আমার হিসাব মতে শতকরা ৮৫ ভাগ ছাত্র সেই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল। যারা অংশগ্রহণ করেছে তারা তো মুক্তিযোদ্ধা হতে পারে না। মুক্তিযোদ্ধাদের নাম তাদের বাবার নামের সাথে মিলিয়ে নিন। এখনতো কম্পিউটার সিস্টেম রয়েছে। ওগুলো ম্যাচ করা যায়। দেখেননা, একই নামে ১০-২০ টা পাওয়া যেতে পারে। তাহলে তো বুঝা যাবে, যারা ৭১ সালে পরীক্ষা দিয়েছে, তারা কেন মুক্তিযোদ্ধা হবে? আমি একটা কথা বলতে চাই, এই দেশটা কিন্তু যদি কেউ বলে মুক্তিযোদ্ধারা স্বাধীন করেছে, এটা ঠিক না। আমরা সবাই মিলে সাড়ে সাত কোটি বাঙালিরা স্বাধীন করেছি। কারণ কিছু পাকিস্তানি লোক ছাড়া আর সবাই বাংলাদেশের পক্ষে ছিল। যেমন এখন একটা কথা খুব চালু রয়েছে, "রাজাকার, রাজাকার।" আমি কিন্তু রাজাকার শব্দটা শুনলে খুব কষ্ট পাই না, কারণ এই রাজাকার কারা ছিল? এই রাজাকার আমার ভাইয়েরাই ছিল। কারণ পাকিস্তানি আর্মি লোকাল চেয়ারম্যানকে বলতো, তোমার দশটা ছেলে দিতে হবে। তাদেরকে দিয়েছেন, তারা অস্ত্র-রাইফেল দিয়ে সাতদিনের ট্রেনিং করেছে, মাসে ২০ থেকে ২৫ টাকা বেতন পেতো। তারা কি সবাই মানুষ মেরেছে? এই রাজাকাররাই তো আমাদেরকে রাস্তা দেখিয়েছে। রাজাকাররাই তো আমাদেরকে হেল্প করেছে। এই রাজাকাররাই তো আমাদেরকে কুমিল্লা ব্রাহ্মনবাড়িয়া রোড পার করিয়ে দিয়েছে। এরাতো মুক্তিযুদ্ধের জন্যই কাজ করেছে। সব রাজাকারেরা কি খারাপ নাকি? আমরা সবকিছু ঢালাওভাবে বলি। এটা ঠিক না। কারণ আমরা যদি বলি মুক্তিযোদ্ধা আর যারা ইন্ডিয়াতে গিয়েছে তারা এদেশ স্বাধীন করে ফেলেছে, এটা মিথ্যে কথা। এই যে আমার দেশের লোকজন যারা আমাদেরকে রাস্তা দেখিয়েছে, আশ্রয় দিয়েছে, খাবার দিয়েছে, যারা আমাদেরকে পৌঁছে দিয়েছে, তারা যদি এটা না করতো, আমরা জীবনে সাকসেসফুল হতে পারতাম না। আর আমি যেটা মনে করি, আমাদের মেজরিটি মুক্তিযোদ্ধা হলো গ্রামের কৃষক শ্রমিক, গ্রামের ছাত্ররা, এদের অনেকেরই বর্তমানে অবস্থা খারাপ। তাদের সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে, তাদের

চিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে। ঠিক আছে তাদেরকে ভাতা দেয়া হচ্ছে, কিন্তু কথা হলো সবারতো এটার প্রয়োজন নেই। যেমন আমার ব্যক্তিগতভাবে ভাতার কোন প্রয়োজন নাই। আমি ভালো আছি। আমি যে কাজটা করি, আমার ঐ ভাতার টাকা দিয়ে আমি অন্য লোকদের সাহায্য করার চেষ্টা করি আর আমি যেটা মনে করি, এই মুক্তিযোদ্ধাদের স্বীকৃতির প্রয়োজন রয়েছে। আপনি আমাদেরকে এমআইএস-এ নাম দিয়ে দিয়েছেন, সার্টিফিকেট দিয়েছেন, ডিজিটাল সনদ দিবেন, অনেক কিছু করবেন কিন্তু আমি একজন ফ্রিডম ফাইটার, আমি যদি একটা কার্ড দেই, সেই নেমকার্ড দেখে আপনি কি বুঝতে পারবেন যে আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা? আমি যদি বীর মুক্তিযোদ্ধা লিখি, এটা নিয়ে আপনার মনে সন্দেহ হতে পারে, এতো বীরমুক্তিযোদ্ধা না ও হতে পারে। কিন্তু আমাদের এই মুক্তিযোদ্ধাদেরকে যদি একটা পদক দেওয়া হয়, যেমন শান্তিকালীন পদক পুলিশে রয়েছে, বিপিএম, পিপিএম, বাংলাদেশ পুলিশ মেডেল, প্রেসিডেন্ট পুলিশ মেডেল, সেনাবাহিনীতে রয়েছে অনেক রকম শান্তিকালীন পদক রয়েছে। অপারেশনাল পদক রয়েছে, বীর প্রতীক, বীর বিক্রম, বীর উত্তম, বীর শ্রেষ্ঠ। যেহেতু আমরা অপারেশন করেছি, আমাদেরকে যদি একটা পদক দেয়া হয়, একটা পদক তৈরি করতে কত টাকা খরচ? ১০০০ টাকাই লাগুক এবং আপনি যদি পদকটার নাম মুক্তিযোদ্ধা গৌরব পদক, বিজয় গৌরব পদক, এরকম বিভিন্ন নাম হতে পারে। একটা পদক দেন যেই পদকের এভ্রিভিয়েশন আমি নামের শেষে ব্যবহার করতে পারব। তাহলে আমার কার্ডে যদি সেটা লেখা থাকে বা আমার নেমপ্লেটে যদি এটা লেখা থাকে, তাহলে যে কেউ বুঝতে পারবে যে, ইনি একজন মুক্তিযোদ্ধা। এটা সরকার চাইলে করতে পারে, এটার জন্য সরকারের খুব বেশি টাকার প্রয়োজন নাই। বিশ-ত্রিশ কোটি টাকা হলেই হবে। আমি বলি না যে, আমাদেরকে সেই পদকের জন্য কোনো এক্সট্রা টাকা দেন। আপনি ভাতা তো দিচ্ছেন। সুতরাং কোনো এক্সট্রা টাকার দরকার নেই। আপনি আমাদের একটা পদক দেন এবং যদি আপনি মনে করেন এই পদকটা দুই রকমের করতে পারেন, যারা সশস্ত্র সংগ্রাম করেছে তাদেরকে এক রকমের দিতে পারেন, আর যারা সহযোগী ছিল তাদেরকে আর এক রকম পদক দিতে পারেন কিন্তু আমি জানি না এই সিস্টেমে আমরা এই দুই লক্ষ দশ হাজারের ভিতর সক্রিয় মুক্তিযোদ্ধা বা অস্ত্রধারী মুক্তিযোদ্ধা, নন অস্ত্রধারী মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে কোনো ভাগ করা হয়েছে কি-না আমার জানা নাই। সেটা করা উচিত। আর আমি নতুন প্রজন্মকে বলবো যে, তোমাদের বাবা, চাচা, দাদা, নানা, মামা, ফুফু যারা

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, সেটা তোমাদের জন্য একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য, একটা নতুন ভবিষ্যতের জন্য, একটা নতুন বাংলাদেশের জন্য যুদ্ধ করেছেন। তাদেরকে শ্রদ্ধা কর, তাদের কথা স্মরণ কর, কারণ আমাদের অনেক মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক চমৎকৃত ঘটনা রয়েছে, অনেক সুন্দর ঘটনা রয়েছে, অনেক দুঃসাহসিক ঘটনা রয়েছে, সেগুলো যদি তোমরা পড়ে, জেনে এবং শিখে তাদেরকে সম্মান কর, তাহলে তাদেরও অনেক ভালো লাগবে আর দেশ অনেক এগিয়ে যাবে।

বীর মুক্তিযোদ্ধা

ড. মো. আব্দুর রহিম খান পিপিএম

(সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি)

আজকে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নতুন প্রজন্ম অর্থাৎ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান-সন্ততিদের ভবিষ্যৎ যাতে করে সুরক্ষিত হয়, সুন্দর হয় এবং মঙ্গল জনক হয়, এর উপরে আমি দু-একটি কথা বলতে চাই। এ দেশে সরকারিভাবে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হলেও যদি পারিবারিক শিক্ষা না থাকে, সামাজিক শিক্ষা না থাকে, ধর্মীয় শিক্ষা না থাকে, তাহলে আপনি মাস্টার্স ডিগ্রি কিংবা পিএইচডি যাই করেন না কেন, কোন লাভ হবে না। মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদেরকে সর্বপ্রথম ধর্মীয় শিক্ষা নিতে হবে। তারপর তাদেরকে স্কুল-কলেজ বা অন্যান্য যে সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা রয়েছে, সেই সমস্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। এবং পড়ালেখার কোন বিকল্প নেই। বর্তমান সময়ে কারিগরি শিক্ষার যে আহ্বান, যে ভবিষ্যৎ, আমি মনে করি মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদেরকে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। তাদেরকে নতুন নতুন ডাক্তার হতে হবে। তাদেরকে নতুন নতুন ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে। নতুন আইটিতে দক্ষ হতে হবে। নতুন অ্যারোনোটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে। নতুন ভাবে তাদেরকে শিক্ষিত হতে হবে এবং সেইসাথে সমাজকে, সমাজের মানুষকে কিভাবে উন্নত করবে, সামাজিক কাজ কিভাবে করবে, ধর্মীয় কাজ কিভাবে করবে, রাজনৈতিক কাজ কিভাবে করবে, এইসকল শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। আর রাজনীতি প্রজন্মের জন্মগত অধিকার। রাজনীতি কেন করবে না? আপনি যখন একটি ভোট দিচ্ছেন, সেটা যে পার্টিকেই হোক না কেন, সেটা তো আপনার বিবেক থেকে বিবেচনা করেই দিচ্ছেন। আমি মনে করি এটাই আপনার

রাজনৈতিক সমর্থন। যদি কেউ বলে যে, "আমি নিরপেক্ষ," এমনকি সেটা যদি মহামান্য রাষ্ট্রপতিও হয়ে থাকেন, ভোট দেয়ার সময় তিনি নিরপেক্ষ নন। তিনি নিরপেক্ষ তখনই, যখন তিনি কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ত থাকেন। অতএব আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে আমরা যেন সর্বদিকে শিক্ষিত হতে পারি। আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা দুটি চোখ দিয়েছেন। এই দুটি চোখ যেন আমরা খোলা রাখতে পারি। আমাদেরকে আল্লাহতা'লা শ্রবণ করার জন্য কান দিয়েছেন। আমরা যেন সেই কান খোলা রাখতে পারি। শুধু শুনে হবেনা, দেখে যেন আমরা বিশ্বাস করতে পারি। শোনা এবং দেখা এই দুইয়ের সম্মিলিত জ্ঞান অর্জন এবং বিশ্বাস, এটা সৃষ্টি করতে হবে। আমি বিশ্বাস করি কিন্তু কাজে করি না। আমি মুখে স্বীকার করি কিন্তু কাজে করি না। তাহলে কি হবে? হবে না। সেজন্য আমার বিশেষভাবে অনুরোধ, শিক্ষা যেন বাস্তব মুখী শিক্ষা হয়। শিক্ষা যেন আদর্শ মুখী শিক্ষা হয়। তাহলেই আমরা প্রকৃত মানুষ হতে পারব।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি চারন করা আমাদের জন্য অত্যন্ত দুষ্কর হয়ে পড়েছে। স্বাধীনতার ৫২ বছর পরে এসে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সেই ঘটনাচক্র স্মরণ করা আমার জন্য সম্ভবপর হয়ে উঠছে না। যারা বাস্তববাদী, তারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। কিন্তু যারা কাল্পনিক, তারা ভাববেন যে মুক্তিযুদ্ধের উপরে এত বছর পরে এসে মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিচারণ, এটাই হয়তো কল্পনা। কিন্তু আসলে ১৯৭১ সালের ঘটনাচক্র যদি আপনারা গভীরভাবে লক্ষ্য করেন, দেখবেন সেই সময়ে অবিশ্বাস্য এবং অকল্পনীয় ঘটনা ঘটেছে, যে ঘটনাগুলোর ব্যাখ্যা দেয়া একমাত্র ছবি ছাড়া

আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ১৯৬২ সালে যখন আমি বাগেরহাট পিসি কলেজের ছাত্র ছিলাম, আমি ছাত্রলীগ করতাম। তখন শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করেছি। আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছি। তখনকার পূর্ব-পাকিস্তানের মাটির জন্য, মানুষের জন্য আন্দোলন করেছি। মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন করেছি। সেই অধিকার আদায়ের সংগ্রাম থেকেই ৬৯ এর গণ আন্দোলন এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এবং যুদ্ধ করেই এই বাংলাদেশকে সৃষ্টি করতে হয়েছে। এ দেশের পতাকাকে ছিনিয়ে আনতে হয়েছে। আমাদের মা-বোনদের ইজ্জত, সম্মান নষ্ট করবার প্রতিশোধ নিতে হয়েছে। পাক হানাদার বাহিনীর অত্যাচার, নির্যাতন, সেই নির্যাতনের প্রতিবাদ করতে গিয়ে আমাদেরকে সশস্ত্র যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছে। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৯ সাল, যখন আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটির ইকবাল হলের ছাত্র, তখন আমি আইন বিভাগে পড়াশোনা করতাম। ইকবাল হলের ৩৭৪ নম্বর রুমে আমি থাকতাম এবং আমাদের তখনকার কিংবদন্তী নেতা জনাব তোফায়েল সাহেব আমার রুমের ঠিক বিপরীতে পূর্বদিকের ৩১১ নম্বর রুমে থাকতেন। আর আমি ছিলাম পশ্চিম দিকে। তার ডাকে তথা তখনকার ছাত্র আন্দোলনের যে ডাক, সেই ডাকই ছিল আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকের সুর। আর আমরা তার সেই ডাকে সাড়া দিয়ে আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ি। ১৯৬৯ এবং ৭০ এর সেই গণআন্দোলন, এটা আসলে বলার কোন বিষয় নয়, উপলব্ধির বিষয়। তখনকার ছাত্ররা যে গণ আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিল, পূর্ব পাকিস্তানের সকল পর্যায়ের মানুষ সক্রিয়ভাবে তাতে সহযোগিতা এবং অংশগ্রহণ করার জন্য গণআন্দোলন গণযুদ্ধে পরিণত হয়েছিল। ১৯৭১ সালে আমি পিসি কলেজের প্রভাষক হিসেবে কর্মরত ছিলাম। যদিও আমি প্রভাষক হিসেবে ১৯৬৯ এ যোগদান করেছিলাম। প্রভাষক থাকা অবস্থায়ই পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন গণ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ, স্লোগান দেয়া, মিছিল করা, এগুলো করছিলাম। সত্য বলতে তখন আমি একটা জিনিসই অনুভব করতে পারতাম, সেটা হলো যে আমি স্বাধীন নই। আমার কথা বলার অধিকার নেই। আমাদের খাওয়ার অধিকার নেই। আমাদের নারী ও শিশু নির্যাতনে বাধা দেওয়ার অধিকার নেই। এই সমস্ত বিষয় গুলো যখন একত্রে পুঞ্জিভূত হয়ে আমাদের হৃদয়ে আঘাত করে, তখন আমরা আর ঘরে বসে থাকতে পারিনি। আমরা ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ি। ৭ই মার্চের ভাষণের দিন আমি

ইকবাল হলে ছিলাম। পুরনো বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে দিতে আমরা আমাদের সক্রিয় আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলাম। আমরা মধুর কেন্টিনে মিছিল করেছি। তোফায়েল ভাইয়ের নেতৃত্বে আমরা যখন মিছিল নিয়ে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) তখনকার রেসকোর্স ময়দানে পৌঁছেছি, সভাস্থান তখন লোকে লোকারণ্য। জনসভা জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছিল। দুপুর ১২টা থেকে আমরা অপেক্ষায় ছিলাম কখন বঙ্গবন্ধু আসবেন। আর যখন তিনি এসে উপস্থিত হলেন, তখন যেন মনে হলো সমস্ত পৃথিবীর মানুষ এক হয়ে গিয়েছে। মানুষের উত্তাল স্লোগান, উত্তাল উচ্ছ্বাস, সেই উচ্ছ্বাসে যখন বঙ্গবন্ধু ভাষণ দিচ্ছিলেন, আর যখন তিনি বললেন, "এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।" এরপরে আর কিছু অবশিষ্ট থাকল না। আমরা সকলে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ি। আমি সেই রাতেই বাগেরহাট চলে যাই। সেখানে পৌঁছে আমাদের নেতা মরহুম শেখ আব্দুল আজিজ, ওনার জন্য অপেক্ষা করি। এবং তার সক্রিয় অংশগ্রহণে আমরা বাগেরহাট জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমিটি গঠন করি। সেই সংগ্রাম কমিটিতে আমিও সদস্য ছিলাম। এবং সেখান থেকে আজিজ ভাইয়ের নেতৃত্বে আমরা মোড়েলগঞ্জ যাই। সেখানেও মুক্তিযোদ্ধা কমিটি গঠন করি। এবং আমার গ্রামের বাড়ি খাউলিয়া ইউনিয়নের সন্ন্যাসী স্কুলের মাঠে আমরা বিশাল জনসমাবেশ আয়োজন করি। সেই জনসভায় আপামর জনতা মিলে আমাকে সংগ্রাম কমিটির সভাপতি নির্বাচন করে। আমি সভাপতি এবং সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে স্থানিও উচ্চপদস্থ যারা উপস্থিত ছিলেন, তাদের সকলকে নিয়ে ঐ হাই স্কুল মাঠেই আমরা একটি মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং ক্যাম্প স্থাপন করি। সেই মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং ক্যাম্পে আমার চাচার একটি বন্দুক ছিল, সেটা দিয়ে স্কুলমাঠে পাকিস্তানি একটি পতাকা ছিল, সেই পতাকাটিকে গুলি করে আমি ছিঁড়ে ফেললাম। সেই স্থানে বাংলাদেশের নতুন পতাকা উত্তোলন করে ১৮ই মার্চ আমরা শুভ উদ্বোধন করি। সেই উত্তাল জনতার মাঝে যে উদ্বেগ, যে উৎকণ্ঠা, যে উত্তেজনা ছিল, তাকে আমরা আরো বেশি প্রেরনা দিয়ে, প্রশিক্ষণ দিয়ে জনতার মনোভাবকে যুদ্ধের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত করে ফেললাম। তখন সেখানে মোড়েলগঞ্জের নেতারা, বাগেরহাট জেলার নেতারা আসলেন। এবং আমাদের কর্মকাণ্ড, আমাদের ক্যাম্প এবং আমাদের যুদ্ধের জন্য যে প্রস্তুতি, এগুলো দেখে তারা সত্যিই খুব মুগ্ধ হলেন। কিছুদিন পরে মেজর জিয়া উদ্দিন আসলেন। তার কিছুদিন পরে শামসুল আলম তালুকদার এবং তার কিছুদিন পরে কমান্ডার কবির আহমেদ মধু যিনি ক্যাপ্টেন মধু আহমেদ নামে পরিচিত। যার নেতৃত্বে সুন্দরবন

সাব-সেক্টরে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, তিনিও আসলেন। সুন্দরবন সাব-সেক্টরে পরবর্তীতে মেজর জিয়া উদ্দিন কমান্ডার ছিলেন। মেজর জলিল ইন্ডিয়া থেকে অনেক অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ সংগ্রহ করে মেজর জিয়া উদ্দিনকে দেন। আমি, মেজর জিয়াউদ্দিন, শামসুল আলম তালুকদার, কবির আহমেদ মধু, লিয়াকত আলি খান, আমরা সবাই একসাথে সুন্দরবনে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করলাম, আর অত্যন্ত গোপনে সেই ক্যাম্পে আমরা মিটিং করলাম যে, এই অঞ্চলে আর কোন কোন ক্যাম্প গুলোকে আমরা পরিচালনা করব। উল্লেখ্য যে, আমি খাউলিয়া ইউনিয়ন ক্যাম্পের ইনচার্জ ছিলাম। সন্ন্যাসী হাইস্কুলের ক্যাম্পটিকে আমি সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করতাম। অপারেশন কমান্ডার হিসেবে আমি বগী, চরদুয়ানী, তুষখালী এবং এই অঞ্চলে আরো ছোটখাটো অপারেশনে পাকিস্তানি আর্মির সাথে সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি।

একদিনের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা না বললেই নয়। চালিতাবুনিয়া গ্রামে আমার চাচাতো ভাই মরহুম শহিদুল ইসলাম খান ও আমি এবং সাথে আমাদের সহযোদ্ধারা, আব্দুল ওয়াদুদ ফরাজি, ডাঃ সালাম খান, মীর জিয়াদ, সাত্তার, আরো অনেক মুক্তিযোদ্ধারা রাস্তা দিয়ে হেটে যাচ্ছিলাম। তখন মোড়েলগঞ্জ বাজার মিলিশিয়া ক্যাম্প থেকে তারা গুলি করতে করতে খাউলিয়া আসে। সেখান থেকে চালিতাবুনিয়া মাদ্রাসার কাছে এসে ঘাটি করে। তখন বাজে বেলা ১২ টা। আমরা সবাই ওঁৎপেতে আছি কখন ওরা ওখান থেকে বের হবে। আমরা যদি তখন চাইতাম, তাহলে হয়তো গুলি করে দু-চারজনকে ফেলতে পারতাম। কিন্তু সেটা আমরা করিনি। আমি সকলকে নির্দেশ দিলাম যে আমরা আর একটু ধৈর্য ধরব।

একটু অপেক্ষা করবো। কারণ ওদের কাছে সব অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ছিল। আমরা হামলা করলে পাল্টা হামলায় আমাদেরও জানমালের ক্ষতি হতে পারে। তাই আমরা আত্মগোপনে থাকলাম। তাছাড়া আমাদের কাছে অত্যাধুনিক অস্ত্র ছিলনা। আমাদের যে অস্ত্র গুলো ছিল, দু'চারটা রাইফেল ছিল, সেগুলি মোড়েলগঞ্জ থানা থেকে লুট করা ছিল। তারপর ওরা যখন বানিয়াখালি গেল, সেখান থেকে পাক হানাদার বাহিনীদের সাথে করে নিয়ে যখন ফিরে আসলো, তখন আমরা তাদের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হই। আমরা তাদের পথরোধ করি। তাদেরকে আর সামনে অগ্রসর হতে দেইনি। আমরা বানিয়াখালি থেকে তাদেরকে অন্য কোনোদিকে আর যেতে দেইনি। আমাদের সাথে যুদ্ধে তারা সবকিছু হারিয়ে সেখান থেকে একটা লঞ্চের সমস্ত যাত্রী নামিয়ে দিয়ে সেই লঞ্চে করে তারা মোড়েলগঞ্জ শহরে ফিরে যায়। আর এজন্য আমরা যারা সন্ন্যাসীতে ঘাঁটি করেছিলাম, তারা ওদেরকে আর মারতে পারলাম না। ওরা পালিয়ে গেল। ওরা বুঝতে পেরেছিল আমাদের অবস্থান। আমাদের যে বিশাল একটা দল এবং আমাদের যে রণকৌশল, এগুলো বুঝতে পেরে ওরা পালিয়ে গেল। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের যে ক্যাম্পগুলো ছিল, যেমন চালতাবুনিয়া ক্যাম্পে আক্রমণ, খাউলিয়া ক্যাম্পে আক্রমণ এবং অন্যান্য জায়গায় তারা বহু আক্রমণ করেছে। কিন্তু আমাদের বিভিন্ন জায়গার ক্যাম্প ইনচার্জরা সতর্ক থাকার কারণে তারা আমাদের তেমন কোন ক্ষয়ক্ষতি করতে পারেনি। আমাদের লিয়াকত আলি খান ভাই যিনি কবির আহমেদ মধুর সাথে টুআইসি ছিলেন, তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে, স্পিডবোট না হয় কান্ট্রি বোটে করে কালিবাড়ি ক্যাম্প, শরণখোলা ক্যাম্প, সুন্দরবন ক্যাম্প, ফয়লাতলি ক্যাম্প, এই ক্যাম্পগুলো টহল দিয়ে দিয়ে অপারেশন পরিচালনা করতেন। বঙ্গবন্ধু কোম্পানি নাম করে আমাদের একটা ক্যাম্প ছিল। এর কমান্ডিং দায়িত্বে ছিলেন আমজাদ মল্লিক সাহেব। আরো ছিলেন আলতাফ, মুজিবুল হক মজনু, মুজিবুর রহমান, হাবিবুর রহমান সাহেব ছিলেন, যিনি ঝিউধারা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এবং সেখানকার কমান্ডার ছিলেন। এবং হাবিবুর রহমান নামে আরো একজন কালীবাড়ি ক্যাম্পের কমান্ডার ইনচার্জ ছিলেন। মাঝেমধ্যে লিয়াকত আলি খান সাহেব তার সাথে একসঙ্গে কাজ করেছেন। আমার বলতে দ্বিধা নাই যে, মোশাররফ হোসেন তালুকদার, সুবেদার গফফার, তিনি আর্মিতে সুবেদার ছিলেন এবং পরবর্তীতে আমাদের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। সেই সুবেদার গফফার এবং সুবেদার আব্দুল

আজিজ, বজলুর রহমান এবং ইদ্রিস আলী জোয়ারদার, এরা সবাই বিভিন্নভাবে বিভিন্ন অপারেশন ফিল্ডে আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন। এক ক্যাম্প থেকে অন্য ক্যাম্পে অস্ত্র গোলাবারুদ সরবরাহ করেছেন। আমাদের নিরাপত্তা, সাধারণ জনগণের নিরাপত্তা দিয়ে গিয়েছেন। তখন সাধারণ মানুষ ভয়ে বাজার ঘাটে আসতে পারত না, আমাদের কোন ক্যাম্পে যেতে পারত না, এই সমস্ত সাধারণ লোক-জনদেরকে আমাদের মুক্তিযোদ্ধা ভাইয়েরা টহল দিয়ে, নিরাপত্তা দিয়ে বাজার ঘাট করিয়েছি। এবং জীবন-জীবিকার কাজে অনেক সাহায্য সহযোগিতা করেছি। বিশেষ করে রায়েন্দার অনেক লোক, অনেক সময় সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, সুবেদার গাফফার, সুবেদার আব্দুল আজিজ, মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, আবু হানিফ মোল্লা, মোহাম্মদ মহিউদ্দিন এবং আরো অনেক নাম, যে সমস্ত নাম গুলো এখন আমার পুরোপুরি স্মরণ আসছেনা। আবার অনেকের কথা স্মরণ আসলে আমার আবেগে কণ্ঠরোধ হয়ে আসে। অনেকে আমাদের মাঝে বেঁচে নেই, চলে গিয়েছে পরপারে। এখন শুধু গোনার দিন যে আমরা কে কে বেঁচে আছি, কে কে মারা গিয়েছে। এরপর এমন একটা সময় আসবে, যখন জানাযা দেয়ার জন্য কোন মুক্তিযোদ্ধা খুঁজে পাওয়া যাবে না। মুক্তিযোদ্ধাদের এখন যেমন আপনারা খুঁজছেন, মুক্তিযোদ্ধা কে কে, তাদের তালিকা করছেন, ভুল হোক সঠিক হোক, ষড়যন্ত্রের শিকার হোক অথবা রাজনৈতিকভাবে স্বীকৃত হোক বা যাইহোক না কেন, তারপরও তারা তো মুক্তিযোদ্ধা। তাদেরকে অবহেলা করা ঠিক হবে না। এজন্য আমি অনুরোধ করব এই যাচাই-বাছাইয়ের নাম দিয়ে যে সমস্ত হয়রানি এবং অপমান করা হচ্ছে, আমি বলব সেই অপমান বন্ধ করে তাদেরকে তাদের প্রাপ্য সম্মান এবং মর্যাদা দিয়ে আগলে রাখুন। তারা যারাই হোক না কেন, এই দেশের সাধারণ জনগণের সহযোগিতা ছাড়া, এই দেশের জনগণের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া এই দেশ কোনদিন স্বাধীন হত না। আমি সবাইকে অনুরোধ করব এখন সেই জিনিসটা ভুলে গিয়ে যারা মুক্তিযোদ্ধারা বেঁচে আছেন, তালিকায় রয়েছেন অথবা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কাজ করেছেন, তালিকায় তার নাম থাকুক অথবা নাই থাকুক, তাদের সকলের ইতিহাস জানা হোক, সোনা হোক এবং সকলকে শোনানো হোক। এই দেশের মানুষের জন্য, এই দেশের স্বাধীনতার জন্য কষ্ট করেছেন, খাবার দিয়েছেন, মুক্তিযোদ্ধাদের যাত্রায় সহযোগিতা করেছেন, অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন, রান্না করা খাবার দিয়ে সাহায্য করেছেন, চাল পাঠিয়ে দিয়ে সাহায্য

করেছেন, সকলকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সম্মান করা হোক। এরকমটি না হলে একটা সময় আপনারা দেখবেন আজকে আপনারা যারা মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা করছেন, পরবর্তী সময়ে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কোন নাম খুঁজে পাবেন না। কিন্তু খুঁজতে হবে মুক্তিযোদ্ধাদের কবর কয়টা আছে এবং কোথায় কোথায় আছে। তখন কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের কবরের ইতিহাস আপনাদেরকে খুঁজতে হবে যে কয়টা কবর পাকা এবং কয়টা কবর নেই। এখন বর্তমানে অনেক মুক্তিযোদ্ধাদের কবর রয়েছে যাদের কবর গুলোকে বাঁধানো হয়নি। আজ হয়ত সেখানে কবর রয়েছে, কালকে সেখানে কৃষি কাজ করবে, কারণ জমির অভাব। যখন কৃষি কাজ করবে, তখন আপনি হাজার খুঁজেও মুক্তিযোদ্ধাদের কবর পাবেন না। শুধু মুক্তিযুদ্ধাদের নামটা শ্বেতপাথরে যে লিখে রেখেছেন, একসময় দেখবেন রাজাকাররা এসে সেই শ্বেত পাথর ভেঙে ফেলেছে। আমার আরো ভয় হচ্ছে, এখন যে সন্তান দাবি করতেছে তার পিতা মুক্তিযোদ্ধা ছিল, কাল রাজাকাররা এসে সেই সন্তানকে তিরস্কার ভৎসনা করবে। সমাজে হেয় প্রতিপন্ন করবে। সমস্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের জন্য আজকে আমাদের কিছু করে যাওয়া দরকার। আমরা যদি সেই সমস্ত সন্তানদের জন্য কিছু করতে পারি, তাদেরকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারি, তাদেরকে যদি জ্ঞান আহরণে সহযোগিতা করতে পারি, তাদেরকে যদি অর্থনৈতিকভাবে আমরা সাহায্য-সহযোগিতা করে প্রতিষ্ঠা করতে পারি, তারা যদি অর্থনৈতিকভাবে এবং বিশেষ করে নৈতিকভাবে ভালো থাকে, তাহলে হয়তো তারা ভবিষ্যৎ সমাজে টিকতে পারবে। তা না হলে এদেশের যে সমাজব্যবস্থা আজকে একরকম, আর আগামীকাল আরেক রকম। আমার ব্যক্তিগত একটা অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। ১৯৭৫ সালে যখন বঙ্গবন্ধু মারা গেলেন, তখন আমি চাপাইনবাবগঞ্জে এসডিপিও। চাঁপাইনবাবগঞ্জের মহকুমা পুলিশ অফিসার হিসেবে আমি কর্তব্যরত ছিলাম। তখন বঙ্গবন্ধু মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক কথায় জিয়াউর রহমানের মার্শাল ল হলো। সেই মার্শাল ল অবস্থায় আমাকে গৃহবন্দী করা হলো। মেজর সবুর তখন বিডিআর থেকে এসে আমাকে গৃহবন্দি করল। সেখান থেকে আমাকে গ্রেফতার করে বগুড়ায় পাঠানো হলো। কয়েকদিনের মধ্যে আমাকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে আমাকে ওএসডি করা হয়। আমাকে রংপুরে এটাচড করে রাখা হয়। বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে সিলেকশন করে, চাকরিতে বহাল করে এদেশের জনগণের সেবা করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। আমরা চেষ্টা করেছি, আমি অতিরিক্ত আইজিপি হিসেবে রিটায়ার্ড করেছি। আমি ১৯ টা

জেলায় এসপি ছিলাম, চারবার ডিআইজি ছিলাম, আমি এডিশনাল আইজি এডমিন ছিলাম, এডিশনাল আইজি ফাইন্যান্স ছিলাম, এডিশনাল আইজি স্পেশাল ব্রাঞ্চ, গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান ছিলাম। অতএব বিভিন্নভাবে আমি কাজ করেছি। চেষ্টা করেছি দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য কিছু করার। কতটুকু করতে পেরেছি জানিনা। তবে সার্থকতা তখনই হবে, যখন এদেশের মুক্তিযোদ্ধারা ভালো থাকবে, এদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের ছেলে-সন্তানরা এবং এদেশের সাধারণ মানুষ ভালো থাকবে। সাধারণ মানুষকে যেন সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করতে না হয়, যে তারা আবার আরেকটা আন্দোলন করবে মুক্তিযুদ্ধের জন্য, সেই দিন যেন আমাদের না আসে। আবার যেন স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কমিটি করতে না হয়। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যদি কমিটি করতে হয়, তাহলে আপনার আমার ইতিহাস তখন মুছে যাবে। তখন আপনার আমার কথা কেউ বলবেনা। আপনাকে আমাকে তারা গালি দিবে। আমাদেরকে যাতে গালি না দেয়, সেই জন্য এখন থেকেই সজাগ থাকতে হবে। আমাদেরকে হিসাব করে কাজ করতে হবে। অনেক সাবধান থাকতে হবে। আমাদের ন্যায়-নীতির সুরক্ষা, আমাদের মানবাধিকার, আমাদের নারী অধিকার, শিশু অধিকার, আমাদের সবগুলো অধিকার যেন আমরা সুরক্ষা করতে পারি।

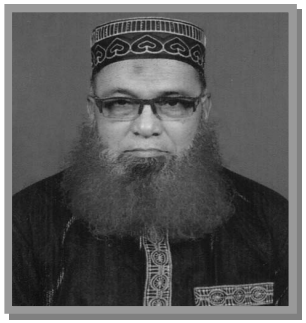

বীর মুক্তিযোদ্ধা

আলহাজ্ব মোঃ জহুর-ই-আলম

যুদ্ধকালীন গ্রুপ কমান্ডার, ৮ নং সেক্টর

০৭ ই মার্চ বাঙ্গালি জাতির জীবনে একটি ঐতিহাসিক দিন, ১৯৭১ সালের ০৭ ই মার্চ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এক বিশাল জনসমাবেশে ভাষণ দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের সূচনা রচনা করেছিলেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ভাষনে বলেছিলেন, "তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো" তোমাদের কাছে যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তা ঘাট যা যা সব কিছুই আছে, আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি তোমরা তা বন্দ করে দেবে। এই বক্তব্যের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি গেরিলা যুদ্ধের দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই ডাকে সাড়া দিয়ে আমি কুমিল্লা ময়নামতি সার্ভে ইনষ্টিটিউটে সার্ভে ডিপ্লোমা থেকে অধ্যায়নরত অবস্থায় গ্রামের বাড়িতে চলে আসি। আমাদের গ্রামের আমি, এ.কে.এম ইদরিস আলী, আব্দুল লতিফ, আব্দুর রাজ্জাক সর্দার, বড়খড়ির অজিত মন্ডল, সুধীর কুমার বিশ্বাস, আবু জাফর মোল্যা, পাথরার আব্দুর রাজ্জাক খান এবং নলদাহ সুশান্ত কুমারকে সঙ্গে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হই। দুলাল মন্দির পার হইয়া সুবিতপুর গ্রামে আব্দুর রহমানের বাড়িতে রাত্রি যাপন করি। ২০ শে জুন ১৯৭১ রানাঘাট ইয়ৎ ক্যাম্পে ভর্তি হই। ভর্তি হওয়ার পর মরহুম জননেতা এ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান এম.পি.এ এর সহিত সাক্ষাৎ হয়। ৩০ শে জুন তারিখ পর্যন্ত রানাঘাট ইয়ুথ রিসিপশন ক্যাম্পে প্রাথমিক

প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। রানাঘাট হতে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত হয়ে কল্যাণী হেড কোয়ার্টারের মাধ্যমে বিহার প্রদেশের বিরভূম জেলার চাকুলিয়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাঠান। সেখানে মাসাধিকাল উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ (এফ.এফ. গেরিলা) করি। চাকুলিয়া প্রশিক্ষণ শেষে আমাদেরকে কল্যাণের মাধ্যমে বয়রা বর্ডার ক্যাম্পে সম্পৃক্ত করেন। সেখানে অবস্থানকালে ৫/৭ মাইল দূরে কাশিপুর হয়ে প্রতিনিয়ত ছুটিপুর ঘাটিতে সেলিং করা, পাক সেনাদের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করার জন্য এ্যাম্বশ করা হতো। কাশিপুর যুদ্ধে ভারতীয় সেনা সদস্যদের সহযোগিতায় আমি আমার গ্রুপসহ যুদ্ধ করি এবং এ যুদ্ধে ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ পাক বাহিনী টুইস মর্টারের গুলিতে আহত হয়ে পুকুর পাড়ে শহীদ হন। আমরা উনার জানাযা ও দাফন কার্য পুকুর পাড়ে সম্পন্ন করি। ৭/৮ দিন পর বয়রা ক্যাম্প থেকে আমাকে গ্রুপ কমান্ডার করে (৫৫) পঞ্চান্ন জন সহযোদ্ধার মধ্যে আমার নামে এস.এম.জি, ও অন্যান্য সহযোদ্ধাদের নামে যথাক্রমে এল.এম.জি, এস.এল.আর, থ্রিনটথ্রি (৩০৩) রাইফেলস, গ্রেনেড ও গোলাবারুদ ইস্যু করে বাংলাদেশে প্রেরণ করেন।

আমি যুদ্ধকালীণ কমান্ডার হিসেবে বাংলাদেশে ঢোকার পথে দুলাল মন্দির নামক স্থানে পাক হানাদার বাহিনীর চলতি গাড়ি লক্ষ করে এলোপাতাড়ি গোলাগুলি শুরু করি। এতে পাক হানাদার বাহিনী ক্ষিপ্ত হয়ে পাল্টা গোলাগুলি করে। আর আমরা পিছু হোটে আখ ক্ষেতে পজিশন নেই। পাক হানাদারদের গুলিতে আমার সহযোদ্ধা মোহাম্মদ কওসার আলী শহীদ হন এবং অপর সহযোদ্ধা মাগুরা সদর উপজেলার তৎকালীণ হাজরাপুর বর্তমানে রাঘবদাইড় ইউনিয়নের মো: আবু বক্কার সিদ্দিক আহত হন।

সেখান থেকে আসার পথে সুইতলা মল্লিকপুরে রাজাকারদের সাথে সংঘর্ষ হয়। এরপর আমি আমার গ্রুপের সহযোদ্ধাদের নিয়ে ধনেশ্বরগাতী গ্রামে নগেন মাস্টারের বাড়ীতে রাত্রি যাপন করি। পরের দিন ধনেশ্বরগাতী কুটি বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ ক্যাম্প স্থাপন করি। ৩/৪ দিন অবস্থান করার পর গজদুব্বা গ্রামে রাজাকারদের সাথে সংঘর্ষ হয়।

শ্রীপুর থানা দখল : ৫ আগস্ট ১৯৭১ আমার গ্রুপ সহ শ্রীপুর আঞ্চলিক বাহিনীর অধিনায়ক আকবর হোসেন মিয়ার বাহিনীতে এসে যোগদান করি। শ্রীপুর বাহিনীর অধিনায়ক আকবর হোসেন মিয়া ও উপ-অধিনায়ক মোল্লা নবুয়ত আলীর নেতৃত্বে বিভিন্ন এলাকায় যুদ্ধ করি এবং শ্রীপুর বাহিনীর সাথে শ্রীপুর থানা দখল

করি সেখানে ৩৪ টি রাইফেলস ও ১৫০০ গুলি উদ্ধার করা হয়।

সাথে যুদ্ধ : সেখান হতে ৩রা সেপ্টেম্বর আমার পূর্ববর্তী ক্যাম্প ধনেশ্বরগাতী কুটিবাড়ি ফিরে আসি। ৫সেপ্টেম্বর লক্ষীপুর বাজার আক্রমণ করি এবং রাজাকারদের হটিয়ে দেয়। ১২ সেপ্টেম্বর আড়ুয়াপাড়া বাজারে রাজাকার ও দুস্কৃতিদের সাথে সংঘর্ষ ঘটার পর একজন দুস্কৃতিকারী আমার গ্রুপের গুলিতে নিহত হন।

তালখড়ি যুদ্ধ : ১৩ সেপ্টেম্বর শালিখা থানার তালখড়ি নামক গ্রামে আমি আমার সঙ্গীদের ও অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে পাক হানাদারদের সাথে যুদ্ধ করার সময় ০৭ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন।

ইছাখাদার যুদ্ধ : ২৬ সেপ্টেম্বর আমার নেতৃত্বে ইছাখাদা নামক স্থানে যুদ্ধ হয়, এ যুদ্ধে আমার নিজ গ্রামের সহযোদ্ধা মো: আব্দুল লতিফ, মো: আব্দুর রাজ্জাক, মো: এ.কে.এম ইদ্রিস আলী এবং তৎকালীণ হাজরাপুর বর্তমানে রাঘবদাইড় ইউনিয়নের মাঝাইল গ্রামের আমার গ্রুপের অপর সহযোদ্ধা মো: আবু বক্কার সিদ্দিক, মো: আব্দুস সত্তার কৃতিত্বপূর্ণ সম্মুখ যুদ্ধ করেন। এবং এ যুদ্ধে পুলের কাছে (০৭) সাত জন রাজাকার নিহত হয়।

হাওড়ের যুদ্ধ : ৬ ই অক্টোবর আমি আমার গ্রুপ সহ হাওড়ে যাওয়ার পথে পাক হানাদার বাহিনীর গাড়ি লক্ষ করে গোলাবর্ষণ করে সেখান থেকে সরে পড়ি।

বিনোদপুরের যুদ্ধ : ৮ ই অক্টোবর অধিনায়ক আকবর হোসেন মিয়ার নেতৃত্বে আমার গ্রুপের সহযোদ্ধাদের নিয়ে বিনোদপুরে রেঞ্জার পুলিশ ও রাজাকারদের সাথে তুমুল যুদ্ধ করি। এ যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা মুকুল শহীদ এবং

গোলাম মোস্তফা গুলিবিদ্ধ হন। এছাড়া ০৪ জন রাজাকার মারা যান।

কাজলীর যুদ্ধ : ১০ ই অক্টোবর আকবর হোসেন মিয়ার নেতৃত্বে আমি আমার গ্রুপের সহযোদ্ধাদের নিয়ে কাজলী ঘাটে যুদ্ধ করি। পাকিস্তানিবাহিনী নদী পার হওয়ার চেষ্টা করলে তাদের উপর আক্রমণ করি। বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকার হতাহত হয়

টিকারী বাজারের যুদ্ধ : ১৬ অক্টোবর টিকারী বাজারে আমার নেতৃত্বে পাক হানাদার ও রাজাকারদের সাথে যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে (০১) এক জন পাক সেনা নিহত হয়।

পুনরায় মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প কুটি বাড়ি ফিরে আসা : ২০ অক্টোবর আমার গ্রুপের (৫৫) পঞ্চান্ন জন সহযোদ্ধা কুটিবাড়ি ক্যাম্পে অবস্থান করেন। পরের দিন ২১ তারিখে আমি ২২ জনকে সাথে করে তিতারখাঁ পাড়া গ্রামের আলি আহম্মদের বাড়িতে রাত্রি যাপন করি।

জাগলা ব্রিজে যুদ্ধ : ২১ তারিখে আলি আহম্মেদের বাড়ীতে অবস্থানরত অবস্থায় ঐ দিন জানতে পারলাম যশোর হইতে জাগলা ব্রিজরে উপর দিয়ে পাক সেনারা বিভিন্ন মালামাল নিয়ে তাদের বিভিন্ন গন্তব্যে এই পথে যাতায়াত করে। কারণ পাকসেনাদের যশোর খুলনা মহাসড়কে চলাচলের একমাত্র রুট বা গন্তব্য পথ, এ জায়গা দিয়ে তাদের জন্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রসদ (মালামাল / অস্ত্র ও গোলাবারুদ) আসত।

২২ অক্টোবর আমি আমার গ্রুপের সকল সহযোদ্ধাদের নিয়ে বিকেল বেলা নৌকাযোগে জাগলা ব্রিজের উত্তরে রাস্তার পূর্ব পাশে পুকুড়পাড়ে অবস্থান নিই এবং ব্রিজের বর্ডার ভাঙ্গতে শুরু করি যেন পাক বাহিনীদের জীপ গাড়ি সে রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে না পারে সে লক্ষ্যে ব্রিজের বর্ডার ভাঙ্গতে শুরু করি। পূর্বেই এখানে রাজাকারদের ক্যাম্প ছিল, রাজাকার মারফত সংবাদ পেয়ে পাকসেনারা ব্রিজে এসে ব্রিজের দক্ষিণপাশে অবস্থান নিয়ে আমাদেরকে লক্ষ করে গোলাগুলি শুরু করলে আমরা ব্রিজের উত্তরে রাস্তার পূর্ব পাশে পুকুর পাড়ে অবস্থান নিই এবং রাজাকার ও পাকসেনাদেরকে লক্ষ করে পাল্টা গোলাগুলি শুরু করি এতে ওখানে তুমুল আকারে রনক্ষেত্র তৈরি হয়, আমরা সুকৌশলে তাদের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধ করি। পরবর্তীতে আমরা আত্মরক্ষার্থে সেখান থেকে সরে পড়ি। পরের দিন

সকালবেলা আমরা জানতে পারলাম এ যুদ্ধে ০১ এক জন পাক সেনা ও ০২ দুই জন রাজাকার মারা গেছে।

বরইচারার যুদ্ধ : অক্টোবর মাসের শেষের দিকে মাগুরা শালিখা সীমান্তে আসবা-বরইচারা নামক স্থানে আব্দুল লতিফ, আব্দুর রাজ্জাক, এ.কে.এম.ইদ্রিস আলী, মো: আবু বক্কার সিদ্দিক, মফিজ মোল্লা, আনোয়ারুল ইসলাম ওরফে নফশের, আবু জাফর সহ আমার গ্রুপের ২০/২৫ জন সহযোদ্ধাকে সাথে নিয়ে ০৩ নং গ্রুপ কমান্ডার, বি.এম.তকব্বর যুদ্ধকালীন (এফ.এফ) কমান্ডার জে,বি,নং- ৪৮৩৬৯ মাগুরা সদর থানা মুক্তিবাহিনীর সাথে যৌথ ভাবে রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করি। ঐ যুদ্ধে ০৩ জন রাজাকার মারা যায়। আর বাকি রাজাকাররা পালিয়ে যায়।

শ্রীপুর বাহিনীর সাথে আমার বাহিনী নিয়ে বরিশাটের (ইটখোলায়) যুদ্ধ : ৭ ই নভেম্বর শ্রীপুর বাহিনীর সাথে বরিশাটের গাংনালিয়া ও ইটের ভাটায় রাজাকারদের সাথে যুদ্ধ করি। এবং দীর্ঘ সময় শ্রীপুর বাহিনীর সাথে সম্পৃক্ত থেকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময় যুদ্ধ করি।

শ্রীপুরের নাকোল বাজারের যুদ্ধ : ২৪ নভেম্বর আমি আমার সহযোদ্ধাদের নিয়ে আকবর হোসেন মিয়া ও মোল্লা নবুয়ত আলীর নেতৃত্বে নাকোল বাজারে অবস্থান করি। পাকিস্তানি সেনারা ক্যানালের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় আমরা আক্রমণ করি এতে পাক সেনাদের গাড়ি ক্যানালের নিচে পড়ে যায়। একজন কর্ণেল সহ (০৭) সাত জন সেনা নিহত হয়।

পুনরায় মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প কুটি বাড়ি ফিরে আসা : এরপর ২৫ নভেম্বর শ্রীপুর বাহিনী থেকে আমি আমার পূর্বের ক্যাম্প ধনেশ্বরগাতী কুটিবাড়ী চলে আসি।

কুচিয়ামোড়া বাজার আক্রমণ : ৪ ডিসেম্বর কুচিয়ামোড়া বাজার আক্রমণ করে রাজাকারদের হটিয়ে দিই।

সহযোদ্ধাদের সাথে বেরইল গ্রামে অবস্থান : ৬ ডিসেম্বর সহযোদ্ধাদের নিয়ে বেরইল গ্রামে অবস্থান করি। মিত্র বাহিনী মাগুরাতে বিমান হামলা চালায়, আনসার ক্যাম্পের পাশে পেট্রোল, ডিপো, পি.টি.আই এবং ভায়নাতে বোমা বর্ষণ করে। পেট্রোল ডিপোতে আগুন দেয়। ইতোমধ্যেই পাকিস্তানি সেনারা বেলনগর হয়ে কামারখালী চলে যায়। যাওয়ার পথে ক্যানেলের ব্রিজটি উড়িয়ে দেয়। মর্টারসেল

মারতে মারতে পিছু হটতে থাকে। মিত্র বাহিনীর একটি ক্যাম্প বিধ্বস্ত হয়। ট্রাকে অবস্থানরত ০৭ জনের মধ্যে ০২ জন শহীদ হয় এবং ০৫ জন গুরুতর আহত হয়।

মাগুরা শহর শত্রু মুক্ত : ৭ ডিসেম্বর মাগুরা মুক্ত হয়, আমরা বিজয় উল্লাস করতে থাকি। নৌকা পাল তুলে দেরে পাল তুলে দে...গানটি গাইতে গাইতে মাগুরাতে প্রবেশ করি, চারদিকে বিজয় উল্লাস ছড়িয়ে পড়ে।

বিজয় উল্লাস : ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস। বিশ্বের সেরা যোদ্ধা পাকিস্তানি বাহিনী মিত্র বাহিনী, মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। ৩০ লক্ষ শহীদ এবং ০২ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে ০৯ মাসের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পাই লাল সবুজের পতাকা, পাই স্বাধীনতা। এরপর আমি আমার গ্রুপের কোন সহযোদ্ধাদের বাড়িতে যেতে না দিয়ে মরহুম জননেতা আসাদুজ্জামান এম.পি. এর অনুমতিক্রমে কাটাখালী মিলঘরে ক্যাম্প করি। পরবর্তীতে অস্ত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ হলে মাগুরা নোমানী ময়দানে মিলিশিয়া ক্যাম্পে অস্ত্র জমা দিই।

২০০৩ সাল থেকে অদ্যাবদি পর্যন্ত

মাগুরার মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক সহযোগিতা : ২০০৩ সাল থেকে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ মাগুরা সদর উপজেলা কমান্ডের কোন সময় আহবায়ক এবং উপজেলা কমান্ডার হিসেবে বার বার নির্বাচিত হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক সহযোগিতা করে আসছি।

বীর মুক্তিযোদ্ধা

নুরুজ্জামান মোড়ল

যেদিন প্রথম পাকিস্তানি মিলিটারি আসে, সেইদিন আমার একমাত্র ভগ্নিপতিকে ওরা গুলি করে মেরে ফেলল। এই ঘটনাটা আমাদের পরিবারের সকলের মনের মধ্যে প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়ে দিলো। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম যে আমরা মুক্তিযুদ্ধে যাবো। তখন আমরা দুই ভাই আমি ও আমার বড় ভাই বজলুল করিম এবং আমাদের মোড়ল পরিবারের আরও নয় জন, আজমল ফকির, ওহিদ, শহীদ মোড়ল, আফজল মোড়ল, রুহুল শেখ, নূর শেখ, আহমেদ শেখ মিলে মোট এগারো জন ইন্ডিয়া চলে যাই। ইন্ডিয়া পর্যন্ত পৌঁছাতে আমাদের অনেক কষ্ট করতে হয়েছিল। অনেক প্রতিকুল পরিবেশ উপেক্ষা করে, বৃষ্টি-কাদা, নদী-পানি, ছেঁড়া বস্তা মাথায় দিয়ে ছয় রাত ছয় দিন বসে আমরা ইন্ডিয়াতে পৌঁছাই। সেখানে আমরা বনগাঁতে যাই। সেখান থেকে ট্রেনে আমরা বসিরহাটে চলে যাই। সেখানে রহমান সাহেব রিক্রুটিং অফিসার ছিলেন। উনি আমাদের রিক্রুট করে টেট্রা ক্যাম্পে পাঠালেন। সেখানে এগারো দিন থাকার পরে আমাদের পিপা ক্যাম্পে ট্রেনিংয়ের একটা সুযোগ আসলো। আমাদের গ্রুপের মধ্য থেকে তিনজন লোক চলে গেল। বাকি আমরা ক'জন পিপা ক্যাম্পে থেকে গেলাম। এখানে প্রচণ্ড পরিমানে কাদা ছিল। কাদায় কখনো হাটু পর্যন্ত, কখনোবা কোমর পর্যন্ত দেবে যেত। এই কাদার মধ্যেই তাবু টানানো আর নিচে তাবু বিছানো ছিলো। এখানে আমি থাকতে লাগলাম। এখানে থাকা অবস্থায় আমার প্রচণ্ড জ্বর আসলো। পনের দিন থাকার পরে আমাদেরকে বিহারে পাঠিয়ে দেয়া হলো। সেখানে চাকুলিয়াতে আমাদের ট্রেনিং সেন্টার হলো। সেখানে প্রচুর সাপের উপদ্রব ছিল। একটা বিশেষ

পদ্ধতিতে এখানে ঘরগুলো বানিয়ে আমরা থাকতে লাগলাম। সকালবেলা উঠে দেখতাম বিশ থেকে ত্রিশটা সাপ আমাদের ঘরের চারপাশ দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওগুলোকে আমরা পিটিয়ে মারতাম। সাপ ছাড়াও অনেক বড় বড় চেলা আসত। মারতে মারতে একপর্যায়ে সেগুলো কমে গেল। এখানে আমাদের গোসলের তেমন কোনো ব্যবস্থা ছিলনা। সবার জন্য এক মগ করে পানি নির্ধারণ করা ছিল। তাই দিয়ে কোনরকমে গোসল করতে হতো। এখানে আসার সময় একটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল। এক একটা গাড়িতে পঞ্চান্ন জন করে ছেলে সহ দুটো গাড়ি আসলো। আসার সময় পথিমধ্যে আমি যে গাড়িতে ছিলাম, সেই গাড়িটা এক্সিডেন্ট করলো। প্রত্যেকেই কম-বেশি জখম হলো। গাড়িটা রাস্তার পাশে একটা খালের মধ্যে উল্টে পড়ে গিয়েছিল। তখন ভাটির সময় ছিল বিধায় তেমন পানি ছিল না, কিন্তু আমি কাদার মধ্যে পড়ে গলা পর্যন্ত কাদার মধ্যে ডুবে গেলাম। আমি মোটামুটি রকম জখম হয়েছিলাম। গাড়ির পিছনের দিকে দরজার কাছে বুলেটের বাক্সার উপরে আমি বসা ছিলাম। যখন গাড়িটা উল্টে পড়ে গেল, তখন আমি গাড়ির পিছনে পাদানিটার ফাঁক দিয়ে পিছলে নিচে পড়ে গেলাম। সবাই আমাকে অন্ধকারের মাঝে অনেক খোঁজাখুঁজি করে পেল। এবং কাদার ভেতর থেকে গাড়ির নিচ দিয়ে টেনে বের করল। তখন আমি আমার বুকে চাপ খেয়েছিলাম। যাহোক এরপরে আমরা বেগুনদিয়া ক্যাম্পে চলে গেলাম। সেখানে তিন দিন থাকার পরে সিদ্ধান্ত হল আমাদেরকে বাংলাদেশে চলে যেতে হবে। বাংলাদেশে রওনা হয়ে বয়রা বর্ডারে পৌঁছানোর পর সেখানে আমার পেট থেকে অস্বাভাবিক ভাবে রক্ত ঝরতে লাগলো। তখন ওরা আমাকে সেখানে হাসপাতালে রেখে চলে আসতে চাইলো। কিন্তু আমি থাকতে চাইলাম না। আমার অস্ত্র আরেকজনের হাতে দিয়ে অনেক কষ্ট করে আমাকে আসতে হলো। আমাদের কমান্ডিং অফিসার ছিলেন ক্যাপ্টেন তাজুল ইসলাম। আর আমাদেরকে গাইড করে নিয়ে আসলেন প্রফেসর মোয়াজ্জেম হোসেন। আসার সময় আড়পাড়া নামে সেখানে একটা জায়গা ছিল। এখানে একটা রাজাকার ক্যাম্প ছিল। যাওয়ার সময় আমাদেরকে এই ক্যাম্পের সামনে দিয়ে যেতে হয়েছিল। এবং ফেরার সময়ও এই ক্যাম্পের সামনে থেকে আমাদের ফিরতে হয়েছে। এই ক্যাম্পের কাছে একটা রেল স্টেশন আছে। সেখানে হঠাৎ ডাকাত বাহিনী আক্রমণ করল। আমাদের দলের সদস্যরা ডাকাত বাহিনীর ভয়ে সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে দৌড়ে পালাতে লাগল। কেউ চলে গেলে ধানক্ষেতে, কেউ চলে গেল আখ ক্ষেতে। আমরা তিনজন এক বাড়ির রান্না ঘরের

পিছনে গিয়ে পালালাম। সেখানে রান্নাঘরের দরজা খোলাই ছিল। হালকা ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল। আমরা তিনজন রান্না ঘরের ভিতরে ঢুকে গেলাম। ঢুকে দেখি পান্তা ভাত আর ইলিশ মাছ জাল দেওয়া। তখন আমার পেটে প্রচণ্ড খিদে ছিল। তিন দিন যাবত ধরে আমাকে তেমন কিছুই খেতে দিতনা। শুধু একটু চিরে খেতে দিত। আমরা তিনজনেই খুব ক্ষুধার্ত ছিলাম। ওই খাবারগুলো দেখে আমরা তিনজনেই লোভ সামলাতে পারলাম না। পেট ভরে খেলাম। খাওয়ার পরে শরীরে শক্তি ফিরে আসলো। অনেকটা সুস্থ লাগলো। এরপর আমাদের কমান্ডিং অফিসাররা সবাইকে সবাই খুঁজে বের করেছে, কিন্তু আমাদের মাঝে একটা ছেলে হারিয়ে গেল। ওর নাম ছিল আজমল ফকির। আমার বাড়ির পাশেই বাড়ি। ওকে আর খুঁজে কোথাও পাওয়া গেল না। ওর অস্ত্রটা আমাকেই বহন করে চলে আসতে হলো। চলে আসলাম আরপাড়ায় সেই রাজাকার ক্যাম্পের সামনে। সেখানে এসে আমরা একটা টুইঞ্চ মর্টার মারলাম। আওয়াজ পেয়ে রাজাকাররা সব পালিয়ে গেল। সেখানে একটা বাজার ছিল। বাজারে গিয়ে সবাই খাওয়া-দাওয়া করতে লাগলো। কিন্তু আমাকে কেউ কিছু খেতে দিতে চাইল না। আমাকে রেখে সবাই বাজারের ভিতরে ভিতরে গিয়ে খেতে লাগল। আমি তো খেয়ে আসছি। আমার খাবার কোন প্রয়োজন ছিল না। এরমধ্যে সেই হারিয়ে যাওয়া আজমল গেঞ্জি একটা গায়ে, হাফপ্যান্ট পরা, হঠাৎ এসে হাজির। আমরা আবার সবাই এক হয়ে রওনা করলাম। সবাই একটা নৌকায় চড়লাম। নৌকায় করে কোলায় আসলাম। কোলা থেকে আমরা ঐ একই নৌকায় বাদুখালি স্কুলে এসে নামলাম। এখানে পৌঁছতে পৌঁছতে রাত হয়ে গেল। সেই স্কুল ঘরের এক একটা রুমে আমরা পাঁচ-সাতজন করে থাকলাম। কেউ আবার বারান্দায় থাকলো। আমার তখন প্রচণ্ড ঘুম পেলো। আমি তখন তিনটা চেয়ার এক করে তার উপরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ স্টেনগানের গুলির আওয়াজে আমার ঘুম ভাঙলো। সেখানে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল। বারান্দায় টেবিলের উপরে স্টেনগান রেখে আমাদেরই দলের একজন সদস্য নাম কিয়াম, সে বসেছিল। আরেক সদস্য এসে স্টেনগানের ট্রিগারে ময়লা দেখে পরিষ্কার করার উদ্দেশ্যে ট্রিগারে হাত দিলো। অমনি ফায়ার হয়ে গেল। ফায়ার হতেই স্টেনগানের সামনে থাকা তিনজন গুলিবিদ্ধ হয়ে ওখানে লুটিয়ে পড়ল। একজন ওখানেই মারা গেলো। বাকি দুইজন আহত। এভাবে ওখানে আমরা তিন দিন থাকলাম। ওখানে বসে আমাদের কোথায় কোথায় ক্যাম্প হবে, তাই নিয়ে সিদ্ধান্ত হলো। সন্তোষপুরে

ক্যাম্প করা হলো। সেখানে গিয়ে আমরা সাত-আট দিন থাকলাম। সেখান থেকে আমাদের একটা প্লাটুন দোয়াখালি ঠাকুরবাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হলো। আমাদের প্লাটুন কমান্ডার ছিলেন লেফটেন্যান্ট রেজাউল কবির। উনার অধীনে থাকাকালীন অবস্থায় একদিন আমরা দেপাড়ায় যাচ্ছি মাছ মারতে। ওখানে পুকুরে গ্রেনেড দিয়ে আমরা মাছ মারতাম। ওখানে বড় বড় কাতলা মাছ পাওয়া যেত। সেদিন মাছ মারতে যাওয়ার পথে দেপাড়া ব্রিজ এর আগে রাস্তার উপরে রাস্তা সংস্কার করার কাজে ব্যবহারকৃত বেশ বড় একটা রোলার রাখা ছিল। সেই রোলারের আবডালে রাজাকাররা লুকিয়ে ছিল। আমরা তিনজন যাচ্ছিলাম। আমি ছিলাম সবার আগে। রাজাকাররা যে খাকি প্যান্ট পড়ে লুকিয়ে আছে, সেটা আমার নজরে আসলো। আমি আমাদের সাথে থাকা বায়েজিদ ভাই কে বললাম, "বায়েজিদ ভাই, ঐ যে রাজাকার। শিগগির পজিশন নেন।" এই বলেই ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম, আর একটা ফায়ার করলাম। ফায়ার করতেই রাজাকাররা পড়ে দৌড় দিল। আর আমরাও পিছনে ধাওয়া করলাম। ধাওয়া করতে করতে একেবারে বাগেরহাটের কাছে নিয়ে গেলাম। দৌড়ানোর মধ্যে ওরা রাস্তায় অনেক কিছু ফেলে রেখে গিয়েছিল। জুতো, গায়ের চাদর, রাইফেল, গুলির কার্ট্রিজ এইসব। আমাদের ক্যাম্প থেকেও অন্যান্য সদস্যরা চলে এসেছিল। আমরা ওগুলি কুড়িয়ে নিয়ে বাড়ি চলে আসলাম। এর আট-দশ দিন পরে আরেকটা যুদ্ধের সংবাদ আসলো। ষোলশত রঘুনাথপুরে মাইন উদ্দিন চেয়ারম্যানের বাড়িতে অপারেশন করতে হবে। এটা ছিল পিরোজপুর জেলার ভিতর। সেখানে যেতে হবে। এবারে আমাদের থ্রি প্লাটুন থেকে এক সেকশন, এগারো জনকে নিল। সেই এগারো জনের ভিতরে আমি পড়লাম, হোসেন নামে একজন ছিল। ঈশারাত নামে একজন ছিল। আমরা সেই এগারো জন একসাথে রওনা করলাম। রাত দুইটার দিকে আমরা গজালিয়া হাটে পৌঁছালাম। হাটে গিয়ে আমরা প্রত্যেকে তিনটা করে রুটি খেলাম। তারপরে বিশাল বলেশ্বর নদী পার হলাম। নদী পার হয়ে খাজুরিয়া হাটে গিয়ে পৌঁছাই। সেখানে পৌছে আমরা প্ল্যান করলাম যে, কোথায় কোন পজিশনে ডিফেন্স হবে। সিদ্ধান্ত হলো এগারোটা পজিশনে ডিফেন্স হবে। আমাদেরকে মইনুদ্দিন চেয়ারম্যানের বাড়িতে ঢুকতে হবে। আমরা সোজা পথ ধরে হেটে চললাম। এরপরে একটা সুপারি বাগানের ভিতর পজিশন নিলাম। আমাদের প্রত্যেকেরই গায়ে একটা গেঞ্জি, আর হাফ প্যান্ট ছিল। আমরা বুঝতে পারিনি যে ঐ বাগানের ভিতর এত জোঁক ছিল। আমাদের সবার শরীরে জোঁকে

আক্রমণ করল। অসংখ্য জোক। তখন আমরা জোক ছাড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। জোক ছাড়িয়ে আমরা ওখান থেকে বের হয়ে একটা কলা বাগানের ভেতরে ঢুকলাম। সেখানে গিয়ে আমরা পরিকল্পনা করতে লাগলাম যে, কিভাবে আমরা মইনুদ্দিন চেয়ারম্যানের বাড়িতে ঢুকবো। বিশ ইঞ্চি গাঁথুনির পাঁচিল। সেই পাঁচিল ভেঙে ভিতরে থ্রি ইঞ্চ মর্টার শেল ছুঁড়তে হবে। এখন সেই দেয়াল কি করে ভাঙবো। অন্য বাড়িতে গিয়ে অনেক অনুরোধ করে একটা শাবল নিয়ে আসলাম। সেই শাবল দিয়ে দেয়াল ছিদ্র করে থ্রি ইঞ্চ মর্টার শেল নিক্ষেপ করলাম। মর্টার শেলের আঘাতে বিল্ডিং এর একটা কর্নার উড়ে গেল। সেখানে প্রায় ৮০ জন রাজাকার ছিল। ওরা সবাই জোরে জোরে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ" পড়তে লাগলো। সেইসাথে ওরা একভাবে গুলি চালাতে শুরু করল। আর আমরা অনেকক্ষণ পর পর একটা দুইটা গুলি চালাতে লাগলাম। এভাবে অনেকক্ষণ চলার পরে ওদের গুলি শেষ হয়ে গেল। এবার আমরা একটা জিএফ গ্রেনেড রাইফেলের মাথায় লাগিয়ে বাড়ির ছাদে ছুড়ে মারলাম। আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম যে ওরা খুব উচ্চস্বরে কলেমা পড়তেছে। এর মধ্যে সেই মাইনুদ্দিন চেয়ারম্যান উচ্চস্বরে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে শুরু করলো। চেয়ারম্যানের তিনটা মেয়ে ছিল। তারা ভিতর থেকে বলতে লাগল, "মুক্তিবাহিনী আমাদের বাড়িতে আক্রমণ করতে এসেছে", আর অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতে শুরু করল। আমরা সবকিছু শুনছিলাম। তখন আনুমানিক বেলা নয়টা বাজে। আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম যে ওরা আত্মসমর্পণ করবে, বা প্রস্তুতি নিচ্ছে। এজন্য আমরা অপারেশনটা একটু ঢিলে করে দিয়ে আমাদের একটা ডিফেন্সের ছেলেরা নাস্তা খেতে গেল। কারণ ওদের খুব খিদে পেয়েছিল। এরমধ্যে নাজিরপুর থানা থেকে পাঞ্জাবি পুলিশ আর রাজাকার চলে আসলো। কচুয়া থেকেও রাজাকাররা চলে এসেছে। এসে যখন ওরা দেখল আমাদের ডিফেন্স দুর্বল, তখন ওরা সরাসরি বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেল। আমাদের টুইচ কমান্ডারের নির্দেশ ছিল যে, যখন সে অ্যাডভান্স হবে আমরাও তার সাথে সাথে পিছনে পিছনে এগোতে থাকবো। তো যখন রাজাকার বাহিনী বাড়ির ভিতরে ঢুকতে লাগলো, আমরা ভাবলাম যে আমাদের টুইচ কমান্ডার বোধয় ঢুকতেছে। এই দেখে পরিকল্পনা মোতাবেক আমরা ক্রলিং করে করে বাড়ির ভিতরে ঢুকতে লাগলাম। আর ওরা বাড়ির দোতলায় গিয়ে বারান্দায় পজিশন নিয়ে আমাদের লক্ষ্য করে ফায়ার করতে শুরু করলো। আমার পাশেই হোসেন নামে আমাদের পার্শ্ববর্তী গ্রামের একটা ছেলে

ছিল। রাজাকার বাহিনীর একটা গুলি সেই হোসেনের উরুতে এসে লাগলো। আমি তাকিয়ে দেখলাম যে বাড়ির ভিতর খাকি পোশাক পরা সব রাজাকার বাহিনী। তারপর আমি গুলিবিদ্ধ হোসেনের ঘাড়ের উপরে হাত রেখে ক্রলিং করে করে পিছনের দিকে নিয়ে আসতে শুরু করলাম। এই অবস্থায় আরেকটা গুলি এসে হোসেনের পিঠ দিয়ে ঢুকে বোগল দিয়ে বের হয়ে গেল। একটুর জন্য আমি বেঁচে গেলাম। এই অবস্থায় ওকে নিয়ে পিছনে আসতে আসতে একটা খাল পাড়ি দিয়ে রাস্তায় উঠে আসলাম। ওদিকে আমার অন্য সদস্যদের সাথে রাজাকার বাহিনীর তুমুল গোলাগুলি চলছে। আর আমি হোসেনকে নিয়ে যাব। এখান থেকে বের হয়ে যাওয়া খুব কঠিন কাজ। হোসেন আমাকে বলল, "বেয়াই, তুমি এই অস্ত্র আর গুলি নিয়ে চলে যাও। আমি তো মরেই গেছি।" আমি তখন বললাম, "না, আমি তোরে ফেলে রেখে যেতে পারব না।" কিন্তু ও আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। তখন আমি আমার একটা রাইফেল আর ওর একটা রাইফেল, ওর সত্তর রাউন্ড গুলি আর আমারও সত্তর রাউন্ড গুলি, এগুলোকে নিয়ে আমি চলে আসলাম। এসে দেখি অব্দা রাস্তার উপরে রাজাকাররা টহল দিচ্ছে। এখন আমি এই অব্দা রাস্তা কি করে পার হব। তখন আমি পাশেই একটা হোগলা বনের ভিতরে ঢুকে গেলাম। সেখান থেকে একটা কাভারিং ফায়ার করলাম। গুলির আওয়াজ পেয়েই রাজাকাররা সেখান থেকে সরে গেল। রাজাকাররা সরে গেলেই আমি রাস্তা পার হয়ে আবার হোগলা বনের ভিতরে চলে গেলাম। হোগলা বন পার হয়ে ধান ক্ষেতের মধ্যে গিয়ে পরলাম। সেখানে বড় বড় ধান গাছ ছিল। ধান ক্ষেতের মধ্যে কুঁজো হলে আর মাথা দেখা যায় না। সেখান থেকে ধান ক্ষেত পার হয়ে চলে আসলাম নদীর কুলে। কোমরে গুলি কার্ট্রিজ বেঁধে নিলাম। রাইফেল দুটো বুকের উপরে রেখে চিৎ হয়ে নদীতে ঝাপ দিলাম। চিৎ হয়ে সাঁতরে প্রায় আধা ঘণ্টা বসে নদী পার হলাম। নদী পার হয়ে গিয়ে ওপারে কাদার মধ্যে চিৎ হয়ে শুয়ে পরলাম। কাদার মধ্যে দিয়ে উঠে এসে ধান ক্ষেতের মধ্যে গিয়ে পড়লাম। ধান ক্ষেতের ভেতর দিয়ে এগিয়ে একটা ধানের গাদা পেলাম। ওটার গায়ে হেলান দিয়ে চুপচাপ ভাবতে লাগলাম যে, ওপারে আমার অন্য সদস্যরা তো আটকে আছে। ওরা তো পার হয়ে আসতে পারবেনা। এই ভেবে আমি ওখান থেকেই কয়েকটা কাভারিং ফায়ার করলাম। গুলির আওয়াজ শুনে রাজাকাররা অব্দা রোড থেকে সরে গেল। আর আমরা আমাদের ক্যাম্পে ফিরে আসলাম। সেদিন আমাদের পাঁচ জন মুক্তিযোদ্ধা সেখানে শহীদ হয়ে গেল। পাঁচজন জায়গায়

মারা গেল কিন্তু সেই হোসেন মারা গেল না। সে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পালিয়ে পালিয়ে এক হিন্দু বাড়ির ভিতরে গিয়েছিল। সেই বাড়ির লোকেরা হোসেনকে ভেষজ চিকিৎসা দিয়ে বিশ্রামে রেখে দিল। সেদিন সন্ধ্যার খানিক পরে এক হিন্দু লোক আমাদের ক্যাম্পে আসলো। ক্যাম্পে এসে বলল যে, "আপনাদের একজন মুক্তিযোদ্ধা গুলিবিদ্ধ অবস্থায়, যাকে ওপারে রেখে আসছিলেন, সে আমার বাড়িতে আছে। আপনারা যদি চান, তাহলে গিয়ে তাকে নিয়ে আসতে পারেন।" আমরা আমাদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগলাম, কিন্তু কেউ সেখানে যেতে রাজি হল না। আমি ওই এলাকার আঞ্চলিক ভাষা কিছুটা জানতাম। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমি যাব। কিন্তু আমি এই উদ্ধার অভিযানে কিভাবে যাব। তার একটা পরিকল্পনা করতে হবে। সিদ্ধান্ত নিলাম ফেরিওয়ালার ছদ্মবেশে যাব। একটা নৌকা লাগবে, একডালা চিংড়ি মাছ লাগবে, আর একটা পাত্রে কিছু চাল। এই জিনিসগুলো নিয়ে মাছ বিক্রেতার ছদ্মবেশে ওকে উদ্ধার অভিযানে যাব। পরিকল্পনা মোতাবেক গজালিয়ার হাটে গিয়ে মাছের ব্যবস্থা হল। নৌকার ব্যবস্থা করলাম। সবকিছু গুছিয়ে আনুমানিক সকাল নয়টার দিকে আমি নৌকা নিয়ে খাজুরিয়া হাটের খালের ভিতর দিয়ে ঢুকে গেলাম। "মাছ লাগবে নাকি মাছ"- এই বলে বলে ফেরি করতে শুরু করলাম। এর মধ্যে এক বুড়ি এসে আমাকে ডাক দিল। বলল যে, "বাছা, আমারে কিছু মাছ দিয়ে যাও।" আমি নৌকা দ্বারা করে তাকে কিছু মাছ দিলাম, আর সে মাছের পরিবর্তে আমাকে কিছু চাল দিল। এমন সময় দেখতে পেলাম খাল দিয়ে একটা বড় টাবুড়ি নৌকা আসতেছে। নৌকা ভর্তি রাজাকার দাঁড়ানো। দেখে আমার ভয়ে শরীর ঠান্ডা হয়ে আসলো। আমি বুড়িকে বললাম, "বুড়িমা, আপনি আর একটু দাঁড়ান। ঐ যে স্যারেরা আসতেছে। ওরা তো আমাকে দেখলে মেরে ফেলবে।" আমি তখন ভয়ে ভাবতে লাগলাম যে, কি আছে আমার ভাগ্যে আল্লাহই ভালো জানেন। তখন বুড়ি বললো, "কোন ভয় নেই। আমার দুইটা ছেলেই রাজাকার। আমার দুইটা ছেলেই ঐ নৌকায় আছে।" এই কথা শুনলে পরে আমার মনটা একটু শান্ত হল। এর মধ্যে ওরা ঘাটে চলে আসছে। এসেই আমাকে বলতে শুরু করল, "এই তুই কে? তুই এখানে কি করতেছিস?" তখন বুড়ি বলে উঠলো, "ওরা একটু মাঝেমধ্যে এসে আমাদের একটু মাছ দিয়ে যায়। আমরা তাই একটু খাই। মুক্তিবাহিনীর যন্ত্রণায় নদীতে গিয়ে মাছ ধরা যায় না। ওরা গুলি করে। তোরা চলে যা।" এই বললে পরে ওরা ওদের নৌকা ছেড়ে দিল। আমি দেখলাম যে ওদের নৌকায় মরা লাশের উপরে

আমাদের সেই হোসেন বসে আছে। আমি ওর দিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলাম, ও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। এখন আর কিছু করার ছিলোনা। ওরা ভাটির দিকে নৌকা নিয়ে চলে গেল। আমিও আস্তে আস্তে নৌকা নিয়ে গজালিয়া হাটে চলে আসলাম। আমাদের মুক্তিবাহিনীকে এই খবর বললাম। আমাদের মুক্তিবাহিনী নদীর এই পাড় থেকে ওদের নৌকা লক্ষ্য করে গুলি করে, কিন্তু গুলি অতদূরে পৌঁছায় না। এই করতে করতে রাজাকার বাহিনী হোসেনকে নাজিরপুর থানায় নিয়ে গেল। নাজিরপুর থানায় আমাদের বারইপাড়া গ্রামের এক লোক পুলিশ ছিল। সেই পুলিশ হোসেনের পরিচয় নিয়ে তাকে এগারো দিন পর্যন্ত চিকিৎসা দিয়ে মোটামুটি রকম সুস্থ করে তুলল। হোসেন তখন কমবেশি হাঁটাচলা করতে পারে। হোসেনের বাবা রাজাকার ছিল। আমরা বেশ কয়েকবার তাকে খবর দিয়েছিলাম যে, তোমার ছেলেটাকে এসে নিয়ে যাও। তখন হোসেনের বাবা বলতো, "আমি হলাম রাজাকার, আর আমার ছেলে হয়েছে মুক্তিযোদ্ধা। আমি ওকে আনতে যাব?" এই বলে সে তার ছেলেটাকে আনতে গেল না। আমরা আর কি করবো। সেই পুলিশটা যে হোসেনকে দেখাশোনা করতো, সে একদিন বাইরে কোথাও গেল। তখন রাজাকাররা হোসেনকে ধরল। ধরে গুলি করে মেরে ফেলল। হোসেন এভাবেই শহীদ হয়ে গেল। এরপরে আমরা মুক্ষাইটে আরেকটা যুদ্ধ করলাম। সেই যুদ্ধে এলএমজি ছিল আমার হাতে। তখন আমাদের সাথে হাকিম নামে একটা ছেলে ছিল। সে বর্তমানে শিল্পপতি সেলিম সাহেব। ঢাকায় থাকেন। সেই হাকিম আমার হাত দিয়ে টান দিয়ে এলএমজি নিয়ে রাজাকারদের বাহিনীকে লক্ষ্য করে ব্রাশফায়ার করল। একটা লোকও পরলনা। কুষ্টিয়ার একটা ছেলে ছিল আলবদর বাহিনীর সদস্য। ওর পায়ে একটু আঘাত লাগলো। ও বসে পড়লো। আমরা ওকে ধরে নিয়ে আসলাম। নিয়ে এসে এক পুকুর পাড়ে বাঁধানো ঘাটে ওকে বসিয়ে ডালভাত খাওয়ালাম। তারপর ওকে ক্যাম্পে নিয়ে আসলাম। ক্যাম্পে নিয়ে আসার পর ওকে মারা হলো না। ও খুব কান্নাকাটি করত। দেখে আমাদের খুব মায়া হল। আমরা ওকে পাহারা দিয়ে রাখতে লাগলাম। এর কিছুদিন পরেই আমাদেরকে কোড়ামারায় ট্রান্সফার করা হলো। কোরামাড়ায় প্রত্যেকদিন চার থেকে পাঁচ জায়গার রাজাকাররা আক্রমন করত। ওখানে নদীর ওপারে রাজাকার, আর এপারে মুক্তিযোদ্ধারা। আমার ডিফেন্স ছিল কুন্ডু বাড়ি। ঐদিন রাজাকাররা একসাথে সাতটা জায়গায় আক্রমণ করেছে। রাত আনুমানিক তিনটার সময় ওরা মালোবাড়িতে খুব অত্যাচার নির্যাতন চালাতে শুরু করল।

হঠাৎ আমরা দেখতে পেলাম পানিতে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ হচ্ছে। অন্ধকারের মাঝে কি হচ্ছিল, তা আমরা বুঝতে পারছিলাম না। আমরা টর্চ লাইট জ্বালালাম। দেখলাম তিনজন মহিলা তাদের গায়ে কোনো পোশাক নেই। তখন আমরা ওখানে কুন্ডু বাড়ির ভিতরে একজন বুড়ি মহিলা ছিল, তার কাছে গিয়ে বললাম, "বুড়িমা, তোমার কোন কাপড়চোপড় আছে?" সব ঘটনা খুলে বললাম। বললে বুড়ি বলল যে, "ওনাদেরকে বাড়ির ভিতরে পাঠিয়ে দাও।" তখন আমরা সেই তিন মহিলা কে বুড়ির কাছে পাঠিয়ে দিলাম। বুড়ি তাদেরকে ধুতি কাপড় পরিয়ে তার কাছে রাখলো। সেদিন দুপুর একটার দিকে আমি আর আমার আরেক সদস্য আজিজুল, দুজনে বসে দস্যু বনহুরের বই পড়ছিলাম। আজিজুল জোরে জোরে পড়ছে আর আমি শুনছি। আমার রাইফেলটা ঘাড়ের উপরে হেলান দিয়ে রাখা ছিল। রাজাকার বাহিনীরা খোঁজ নিয়েছিল যে মুক্তিবাহিনীরা কারা কোথায় আছে। রাজাকার বাহিনীর লোকজন অন্দা রোড এর সুইচ গেট এর উপরে বসে এলএমজি দিয়ে আমাদেরকে লক্ষ্য করে ব্রাশফায়ার করল। গুলিতে আমার রাইফেলের ব্যারেলের কাঠ উড়ে গেল। আমার ঘাড়ের কিছু জায়গা কেটে গেল। এছাড়া অন্যকোনো ক্ষয়ক্ষতি হলো না। আজিজুল ওখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেল। কোথায় গেল জানিনা। সেদিন সন্ধ্যা বেলায় আমি আমার কমান্ডিং অফিসার কে বললাম যে, "আমি আর ওখানে ডিফেন্সে যাব না, আমাকে অন্য জায়গায় ডিফেন্সে দেন।" তার পরদিন থেকে আমাকে কোড়ামারায় শেখ বাড়ির দেবীর বাজারে একটা খেয়াঘাট আছে, সেখানে তেঁতুলতলায় ডিফেন্সে দিল। ওপার দেবীর বাজারের হাট, আর এপার কোড়ামারা। ওখানে একটা ছোট মসজিদ ছিল। মসজিদের সামনে তেঁতুলতলায় আমার বাঙ্কার। সেদিন আমি সেই বাঙ্কারে বসে আছি আর আমার সাথে নমির উদ্দিন নামে আরেকটা লোক। ওর বাড়ি ছিল গোটা পাড়ায়। আর আমার সাথে লিয়াকৎ নামে একটা যোগানি ছেলে ছিল। মাঝে মাঝে আমার সাথে বাঙ্কারে এসে বসতো আবার চলে যেত। সেদিন হঠাৎ রাজাকাররা আবার আক্রমণ করেছে। আমার সাথের সেই নমির উদ্দিন বাঙ্কার থেকে লাফিয়ে তেঁতুল গাছের ডাল ধরে ঝুলে পড়ে বলতে লাগলো, "ও রব মামা, তোমার বাবাকে রসগোল্লা মিষ্টি খাইয়ে রেখে এসো। আমরা রাতের বেলায় গিয়ে অপারেশন করে আসবো। ওরে আমার গুলি লেগেছে, ওরে আমার গুলি লেগেছে।" আমি ভয়ে আতঙ্কে তাকে ধরে নামিয়ে দেখি কিছুই হয়নি, দুষ্টুমি করেছে। রব নামে একজন রাজাকার নেতা ছিল, সেই লোক নমির উদ্দিনের

দুঃসম্পর্কের মামা হত। কিছুক্ষণ পরে সে আবার সেই একই দুষ্টুমি করলো। আমি ধরে নামিয়ে দেখি কোন গুলিটুলি কিছু লাগেনি, দুষ্টুমি করতেছে। এরকম সে কয়েকবার করলো। আবার যখন সে বাঙ্কার থেকে উঠে তেঁতুল গাছের ডাল ধরে ঝুলতে গেল, আমি নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু সে আমার কথা শুনল না। দেখলাম যে তেঁতুল গাছের ডাল ধরে ঝুলে আছে। একটু পরে আবার সে বলতে শুরু করল, "ওরে আমার গুলি লেগেছে, ওরে আমার গুলি লেগেছে।" আমি ভাবলাম যে আবার ঠাট্টা করতেছে। আমি বললাম, "যাও, তোমাকে আমি আর ধরবনা।" কিছুক্ষণ পরে দেখতেছি রক্ত গড়িয়ে পড়তেছে। তারমানে দেবীর বাজারের ওখান থেকে গুলি করে দিয়েছে আর এবার সত্যি সত্যি লেগেছে। আমি চিৎকার দিয়ে বললাম, "নমির উদ্দিনের গুলি লেগেছে, তোরা তাড়াতাড়ি ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যা।" আমাদের সাথে কোনরকম প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়ার মত ডাক্তার ছিল। ওরা নমির উদ্দীনকে ধরে ভিতরে নিয়ে গেল। আধা ঘন্টার মত বেঁচেছিল সে। এরপর মারা গেল। আমি আরো দুটো যুদ্ধ করেছিলাম। আমি মোট পাঁচটা যুদ্ধ করেছিলাম। আরেকটা যুদ্ধ করেছিলাম ভাষায়। তখন একটু একটু শীত পড়েছে। আনুমানিক অগ্রহায়ণ মাসের শেষের দিকে। সেখানে রাজাকাররা আমাদের চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলল। তখন আমরা যে যার মত পালিয়ে গেলাম। আমি একটা ধান বনের ভিতরে গিয়ে লুকালাম। তখন ধান গাছের ভিতর হালকা সাদা সাদা মিষ্টি দুধের মতো রস এসেছে। সেই ধান বনের ভিতর সারারাত লুকিয়ে থেকে ধান গাছ চিবিয়ে চিবিয়ে সাদা রস খেলাম। ওখান থেকে বেরোনোর কোন উপায় ছিল না। রাজাকাররা চলে যাওয়ার পর আমরা সবাই আস্তে আস্তে একটা খালের পাড় ধরে খালে নেমে গেলাম। সেই খাল ধরে এগিয়ে দেপাড়ার খালে এসে উঠলাম। দেপাড়ার খাল দিয়ে দেপাড়ার বাজারে এসে উঠলাম। এখানে সবাইকে খুঁজে পেলাম না। কে কোথায় গিয়েছে তার কোন হদিস নেই। তারপর আমরা ধোপাখালী ক্যাম্পে চলে আসলাম। ক্যাম্পে গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখলাম যে, না, আমাদের তেমন কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। কেউ মারা যায়নি। সবাই অক্ষত ভাবে ফিরে এসেছে। ধোপাখালী ঠাকুরবাড়ি, যেখানে আমাদের ক্যাম্প ছিল, সেটা একটা বিশাল বাগান বাড়ি। আমার বয়স তখন মাত্র সতের বছর। ঐ বাগানের ভিতর দিয়ে একটা পথ আছে। সেই রাস্তায় রাত্রেবেলা যখন আমাকে ডিউটি দিত, তখন আমি ভয়ে কাঁদতাম। রাতের বেলা শিয়াল ডাকত। শিয়ালের ডাক শুনে ভয়ে কাঁদতাম। কখন, কে আসে, কোত্থেকে আক্রমণ করে।

এভাবে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম। আমাদের তো তেমন কোনো আশা ছিল না। আমাদের কোনো চাওয়া ছিল না। আমরা শুধুমাত্র দেশ রক্ষার জন্যই গিয়েছিলাম। মা-বোনের ইজ্জত বাঁচানোর জন্য গিয়েছিলাম। যেমন পুলিশ চাকরি করে টাকার প্রয়োজনে, মিলিটারিও চাকরি করে টাকার প্রয়োজনে। বড় বড় অফিসাররা টাকার প্রয়োজনে চাকরি করে। কিন্তু আমরা কোন টাকার লোভে মুক্তিযুদ্ধে যাইনি। আমরা দেশ রক্ষার প্রয়োজনে যুদ্ধে গিয়েছিলাম। এই দেশ যদি স্বাধীন না হতো, তাহলে আমাদের আর বাড়ি ফিরে আসার মত কোন পরিবেশ ছিল না। যেমন আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। উনি রাজাকারদের সাধারণ ক্ষমা করে দিলেন। কিন্তু যদি আমরা যুদ্ধে পরাজিত হতাম, তাহলে পাকিস্তান সরকার কী আমাদের সেভাবে সাধারণ ক্ষমা করে দিত? আমার মনে হয় তা কোনদিন করত না। আমরা দেশ স্বাধীন করেছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই দেশ এখনো পুরোপুরি স্বাধীন হয়নি। দুঃখ লাগে যে অনেক ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা আমাদের প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে ঢুকে তারা এখন বেশি মাতব্বরি করতেছে। আর আমাদের কোনো মাতব্বরি নেই। মুক্তিযোদ্ধারা এখন ২০ হাজার টাকা ভাতা পাচ্ছে, আমরা যদিও এরকম কোন আশা কখনো করিনি। বছরে দুটো শাড়ি গেঞ্জি পাচ্ছি। এবছর একটা গায়ের চাদরও পেয়েছি। সেই গায়ের চাদর গায়ে দিয়ে এ বছর শীত পার করেছি যদিও আমার এর থেকে অনেক দামি দামি চাদর আছে।

আমরা বঙ্গবন্ধুর ডাকে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলাম। পাকিস্তান আমলে উনাকে দেখেছি। যখন আমি খুলনা আলিয়া মাদ্রাসায় পড়তাম, খুলনার বড় মাঠে উনি আসতেন। ওখানে ছোট্ট একটা রুম ছিল। ঐ রুমে উনি বসতেন। আরো কয়েকজন মানুষ উনার সাথে বসতেন। দেখতাম উনি একটা পাইপ মুখে রাখতেন। প্যাকেট দিয়ে তামাক বের করে ওই পাইপে ভরে উনি ওটা খেতেন। আর উনি খদ্দরের একটা পাঞ্জাবী গায়ে দিতেন। মাঝে মাঝে একটা হলুদ চাদর ওনার ঘাড়ের উপরে থাকত। আমি তখন ছোট ছিলাম। হেলিকপ্টারের ভিতরে চা খাওয়ার জন্য কাগজের কাপ পিরিচ পড়ে থাকত, ঐগুলো টুকিয়ে আনতে যেতাম। একদিন উনি আমাকে ডাকলেন, "এই ছেলে, শোনো। এদিকে আসো।" আমি গেলাম। উনি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কোথায় থাকো? কি করো?" আমি বললাম যে, আমি মাদ্রাসায় পড়ি। উনি আমাকে কাছে টেনে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। পকেট দিয়ে পাঁচটা টাকা বের করে আমার হাতে দিলেন।

পাকিস্তান পিরিয়ডে পাঁচ টাকার অনেক মূল্য ছিল। আমি সেই পাঁচ টাকা পেয়ে এত খুশি হলাম। তাই নিয়ে তাড়াতাড়ি হাটা দিলাম। ভয় পেলাম, কেউ না আমার কাছ থেকে সেটা কেড়ে নেয়। এভাবে ঐ একদিন বঙ্গবন্ধু আমাকে পাঁচটা টাকা দিয়েছিলেন।

আমি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ দিতে চাই। তিনি আরও একটা নতুন উদ্যোগ নিয়েছেন। আমাদের মৃত্যুর পরে আমাদের সন্তান-সন্ততি স্ত্রী পরিজন, তারাও এই ভাতা পাবে। এটা অত্যন্ত ভাল একটা উদ্যোগ। উনার জন্য দোয়া করি।

নতুন প্রজন্মের জন্য আমার উপদেশ হচ্ছে তারা যেন এই দেশকে ভালোবাসে।

বীর মুক্তিযোদ্ধা

মোড়ল বজলুল করিম

১৯৭১ সালে ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ শোনার পর মনে মনে নিয়েছিলাম যুদ্ধের প্রস্তুতি। তারপর আরো বিশ্বাস হয়ে গেল ২৫শে মার্চ কাল রাত্র। ২৫ মার্চ কাল রাত্রে অসহায় বাঙ্গালির উপর বিরতীহীন পাক সেনাদের গুলিবর্ষণ, তান্ডবলীলা, জ্বালাও পোড়াও লুটপাট হত্যা, তাই আমরা আর ঘরে থাকতে পারলাম না। আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী সংগঠিত হতে লাগলাম। এক পর্যায়ে আমরা অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মরহুম সুলায়মান মোড়ল, শেখ রুহুল আমিন, বারাশীয়া (ফকিরহাট) গ্রামের ইষ্ট বেঙ্গল রেজিঃ নায়েক আঃ কাদের, আমি নিজে ও আমার ছোট ভাই নূরুজ্জামান (তখন তার বয়স ছিল ১৫/১৬ বছর, সে ছিল আমাদের দলের সবচেয়ে ছোট), ফকির আজমল, মোঃ আজিজুল হক, আহম্মদ শেখ, নূর ইসলাম শেখ, আফজাল মোড়ল এবং পারকুরশাইল গ্রামের শেখ ইশারত আলী, শেখ নজরল ইসলাম, শহীদ শেখ হোসেন আলী, শহীদ মোড়ল, অহীদ শেখ, ইশারত শেখ মোট ১৬ জন আমাদের গ্রাম হতে কেউ কেউ দুপুরের খাবার খেয়ে না খেয়েই যুদ্ধের উদ্দেশ্যে গ্রামের উত্তর দিকে বিলের ভিতর দিয়ে মরহুম আঃ আজিজ মোড়লের খোলা বাচাড়ী নৌকায় করে হানাদার মুক্ত এলাকা দিগংগা বারুইগাতী হয়ে সারলিয়া রাজপাট আমাদের এক আত্মীয় মোঃ হাসেম মিয়া বাড়ীতে রাত্র যাপন করি। ভোর রাতে পায় হেটে চুনখোলা গিয়ে নৌকা যোগে যশোর জেলার আড়পাড়া বরইচারা হয়ে কালিবাবু রোড (সিএন্ডবি) পার হয়ে দিনের বেলায় একটা আখ খেতে দিন যাপন করি। রাতে বাগদা বডারের কাছেই রাত্র যাপন করি। মাদারতলা নামক একটা বাজার পাই কিন্তু কোন বসতি দোকান ছিল না।

পরের দিন সকালে বাগদা বডার পার হয়ে বাস যোগে বশিরহাট ক্যাম্প এ নাম লিখিয়ে ভ্যাবলা ক্যাম্পে অবস্থান করি। স্বসস্ত্র ট্রেনিংয়ের উদ্দেশ্যে আমাদের মধ্য হতে ৩ জন ১) মরহুম সুলাইমান মোড়ল, ২) আফজাল মোড়ল ৩) শহীদ মোড়ল বিহার বীরভূম ট্রেনিং সেন্টারে যায়। পরে ওরা অন্য দলের সাথে ট্রেনিং শেষ করে বাগেরহাটের কান্দাপাড়ার আমজাদ মিঞার সাথে আসে। আমরা বাকি সবাই টেট্রা ক্যাম্পে অবস্থান করি। ৭/৮ দিন থাকার পর বিহার চাকুলিয়া স্বসস্ত্র ট্রেনিং এর উদ্দেশ্যে রওনা হই। একই সঙ্গে আমাদের ইউনিয়নের বাকপুরা গ্রামের শেখ লেয়াকত আলী, শেখ বেয়াজ উদ্দিন ছিল। এবং মোঃ আতিয়ার জোমাদ্দার, মোশারাফ জোমাদ্দার, নওয়াব আলী খা সহ আরো অন্যান্য ইউনিয়নের বীর মুক্তি সেনারা আমাদের সাথে ছিল। পূর্বেই আমাদের গ্রামের আহম্মদ শেখ এবং নূর ইসলাম শেখ কিছু জিনিসপত্র কেনার উদ্দেশ্যে ক্যাম্পের বাইরে আসে এবং পরবর্তীতে আর ক্যাম্পে ফিরে যায় নি। পরে বাকী সবাই স্বসস্ত্র ট্রেনিং নেয়ার জন্য ট্রেন যোগে চাকুলিয়ায় পৌঁছাই। এক মাস ট্রেনিং এর মধ্যে প্রতিটা ইভেন্টে আমি প্রতিযোগীতায় অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পাশ করি ও প্রথম স্থান অধিকার করি। রাইফেল সুটিং এ ১১টা উইংস ছিল এবং সেই উইংস গুলিতে সব প্রতিযোগী ট্রেনারদের মধ্যে আমি প্রথম স্থান লাভ করি। ২য় হয় বাকপুরা গ্রামের শেখ লেয়াকত আলী। ট্রেনিং শেষ করে বেগুনদিয়া ক্যাম্পে আসি। ওখানে মেজর এম এ জলিল (৯নং সেক্টর কমান্ডার) এর কাছে রিপোর্ট করার পর দুই-তিন দিন সেখানে থাকি। পরে ক্যাপ্টেন তাইজুল ইসলাম সাহেবের নেতৃত্বে ৯নং সেক্টরের অধীনে সর্ব বৃহৎ অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত হয়ে শতাধিক মুক্তিসেনা বাগেরহাট শহরের উত্তর অঞ্চলে প্রধান ঘাটি করার উদ্দেশ্যে বড় ২টি বাস যোগে বাগদা বডার পার হওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হই। পথের মধ্যে আমাদের একটি বাস দূর্ঘটনায় সেটির মধ্যে আমি নিজে ও আমার ছোট ভাই সহ আরো অনেকেই ছিলাম। সেখানে আমরা অনেকেই আহত হই। বাসটি বিকল হয়ে গেলে পাশে থাকা ইন্ডিয়ান আর্মিদের ঘাটিতে সংবাদ পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গেই তাদের গাড়ী নিয়ে এসে আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে আমাদের অন্য গাড়ীটি সহ বাগদা বডার পার করে দেয়। আমাদের দলের ভিতর থেকে ৩জন খুব গুরতর আহত হওয়ার কারণে ঐ আর্মি ক্যাম্প হাসপাতালে চিকিৎসা অবস্থায় থেকে যায় এবং তাদের অস্ত্র আমরা নিয়ে আসি। আমরা বডার পার হয়ে নিরাপদ এলাকা দিয়ে খুব সতর্কতার সাথে সোর্সের মাধ্যমে দিনে সুন্দরবন এবং রাতে খুলনা জেলার তেরখাদা থানার এলাকা হয়ে শন্তোষপুর হাইস্কুলে এসে ঘাটি করি যা বাগেরহাট

থানার অর্ন্তগত এবং সেখানে থেকে বিভিন্ন এলাকার পাক বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করি। প্রতিটা যুদ্ধে আমি অংশগ্রহণ করি। নাজিরপুর থানার রঘুনাথপুর ক্যাম্পে আক্রমণ করা কালীন সময়ে আমাদের সঙ্গী শেখ হোসেন আলী সহ ২ জন শহীদ হন। গোটাপাড়া, পানিঘাট, চিরলিয়া বিষ্ণুপুর, বাবুরহাট, বয়াসিংগা নামক এলাকায় পাক বাহিনীদের সাথে বিভিন্ন সময়ে সম্মুখ যুদ্ধ হয়। তাছাড়া চিত্রা নদীর এপার ওপার পাকবাহিনী এবং রাজাকারদের সাথে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ লেগেই ছিল। এর ভিতর আমার স্মরণীয় গোটাপাড়া ও বাবুরহাট যুদ্ধে হানাদার বাহিনীদের পরাস্ত করে ওদের অনেকের লাশ নদী হতে উদ্ধার করি ও সাথে যুদ্ধকালীন সময়ের অনেক অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করি। আমরা যুদ্ধকালীন সময়ে নিজ এলাকায় না থাকার কারণে ঐ সময়ে রাজাকার ও হানাদার বাহিনীরা আমাদের পরিবারের অনেক ক্ষতিসাধন করেছে। রাজাকার বাহিনীর কমান্ডার রজব আলীর লালনকৃত রাজাকাররা আমাদের বাড়ী ঘর লুট-পাট ও জ্বালাও পোড়াও করেছে।

এভাবে পাক হানাদার বাহিনীর সাথে ৭/৮ মাসব্যাপী যুদ্ধ হওয়ার পর এক পর্যায়ে বাগেরহাটের বিভিন্ন এলাকার যুদ্ধে হানাদার বাহিনীরা পর্যাক্রমে পরাজিত হতে থাকে এবং ১৬ই ডিসেম্বর পাক বাহিনী ঢাকায় আত্মসমর্পণ করলে আমরা বাগেরহাট শহর মুক্তকরণ অভিযান অব্যহত রাখি এবং রাজাকার বাহিনীর প্রধান ফকির রজ্জব আলী তার দলবলসহ পালিয়ে যায় এবং ১৭ই ডিসেম্বর আমরা বাগেরহাট শহর দখল করি এবং বিজয় পতাকা উত্তোলন করি। আমরা বাগেরহাটে ক্যাপ্টেন তাইজুল ইসলাম এর নিকট আমাদের সকল অস্ত্র জমা দিয়ে ম্যালেশিয়া ক্যাম্পে থাকি (নূরল আমিন হাইস্কুলে) উল্লেখ্য ম্যালেশিয়া ক্যাম্পে থাকাকালীন আমি বিএইসএম পদে নিযুক্ত হয়ে দায়িত্ব পালন করি। পরে ক্যাম্প বিলুপ্ত হবার পর লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে আমি বাড়ীতে চলে আসি।